ওঁ তৎ সৎ

প্রথম বর্ষ • ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ফাল্গুন ১৪৩১ • প্রথম সংখ্যা

শাশ্বত সত্য

মহাশিবরাত্রি সংখ্যা - ২০২৫

“শাশ্বত সত্য” ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যার মাধ্যমে আমরা শুরু করছি একটি নতুন যাত্রা, যা সনাতন ধর্মের শাশ্বত জ্ঞান ও সত্যকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ‘মহাশিবরাত্রি’ উপলক্ষে এই প্রথম সংখ্যার মাধ্যমে আমরা সনাতন ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান, মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সনাতন ধর্মের বহু বিষয় বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের কু-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ভুলভাবে উপস্থাপিত করছে, এবং আমরা সত্য সনাতনের’ প্রকৃত দর্শন ও গভীরতা থেকে দূরে রয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য সেই ভুল ধারণাগুলি দূর করা এবং সঠিক জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এই বিশেষ সাময়িকীতে থাকবে বৈদিক শাস্ত্র, পৌরাণিক কাহিনী, দার্শনিক তত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সনাতন ধর্মের আধুনিক বিশ্বের সাথে সম্পর্ক এবং এরকম বহু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। শুধু তাই নয়, আমাদের এই প্রয়াসের মাধ্যমে আপনাদের বিভিন্ন প্রকারের শাস্ত্র জিজ্ঞাসা মূলক প্রশ্নের শাস্ত্র নির্ভর উত্তর দেওয়ার ও সংশয় নিরসন করার চেষ্টা করা হবে।

প্রথম সংখ্যায় শিবরাত্রির মহিমা ও তার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে, যা পাঠকদের আত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে নেবে। পাশাপাশি আরো বহু বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। আমরা চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সামনে রাখার। এছাড়াও শিশু কর্নার, প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আরও নানা আকর্ষণীয় বিষয়ও থাকবে, যা এই ম্যাগাজিনকে আরও প্রাণবন্ত এবং সকলের জন্য উপকারী করে তুলবে। পরবর্তী সংখ্যা থেকে চেষ্টা থাকবে কুইজ প্রতিযোগিতায় আয়োজিত প্রশ্ন সমূহের ব্যাখ্যা সহ উত্তর রাখার ‘সনাতন জিজ্ঞাসা’ পাতায়।

আমাদের সাথে থাকুন। এই সংখ্যা পড়ুন, আপনাদের মতামত জানান। আমাদের এই যাত্রায় আপনাদের সঙ্গী হতে আমরা আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাই। একসাথে আমরা সনাতন ধর্মের সত্য, জ্ঞান এবং ঐতিহ্যকে সবার কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হবো। সনাতন ধর্মের নিমিত্তে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

ওঁ নমঃ পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব।
সত্য সনাতন ধর্মের জয় হোক।

শ্রী সৌমিত্র দে
সম্পাদক,
“শাশ্বত সত্য”

সত্যকে অনুসন্ধান করতে হয়, সেই অনুসন্ধান জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়। "শাশ্বত সত্য" মানেই হচ্ছে যা চিরন্তন বা নিত্য। এই মাসিক পত্রিকার (magazine) মাধ্যমে আপনারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন। 'সত্যের সন্ধানে সনাতন' সংগঠনটি শুরু থেকেই সত্যকে উপলব্ধি করানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের মনের ধুয়াশা দূর হবে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমাদের কার্যক্রম শুরু করছি। সত্য সনাতন, সনাতনের ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, বিভিন্ন ধর্মীয় উপাখ্যান, অপপ্রচার খণ্ডন, তন্ত্র, সাধু সন্ত বিষয়ক তথ্য, শিশুদের জন্য সহজ পাঠ্য ছড়া ও ধর্মীয় উপাখ্যান, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারযোগ্য সরল সংস্কৃত শব্দ ও বাক্য, প্রশ্নোত্তর পর্ব সহ সনাতন ধর্ম বিষয়ক বিবিধ তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি সকল সনাতনীর জন্যেই উপযোগী।
অতএব, নিজে জ্ঞানচর্চা করুন এবং অন্যকে চর্চায় উৎসাহিত করুন, পাশপাশি প্রচার করে আমাদের কার্যে উৎসাহ প্রদান করুন.....

সাত্যকি দেব
উপদেষ্টা, **"শাশ্বত সত্য"**

ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যার মাধ্যমে আমরা

"শাশ্বত সত্য" ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা— "সত্যের সন্ধানে সনাতন" -র এক মহৎ প্রয়াস।

এর মূল লক্ষ্য সনাতন ধর্মের শাশ্বত জ্ঞান সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত সত্যের সন্ধান করতে পারে। বর্তমান সময়ে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ও বিকৃত উপস্থাপনা সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে, যার ফলে অনেকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। শাশ্বত সত্য ম্যাগাজিন সেই বিভ্রান্তির অন্ধকার দূর করে আলোর দিশা দেখানোর জন্য এক আন্তরিক প্রয়াস।

এই মহতী উদ্যোগ সফল করতে যারা নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদন নিয়ে কাজ করেছেন, তাদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আপনারা সবসময় এভাবেই SSS-এর পাশে থাকবেন—এই আশাই করি।

জয় শ্রী কৃষ্ণ!
জয় সনাতন!

সুব্রত দাশ
সহ-সম্পাদক, **"শাশ্বত সত্য"**
কোর্স ম্যানেজার, ধর্ম প্রচারক, সম্পাদক (সত্যের সন্ধানে সনাতন)

সূচিপত্র

প্রথম বর্ষ - প্রথম সংখ্যা - ফাল্গুনী ১৪৩১

সমগ্র পরিচালনা ও প্রকাশনা - 'সত্যের সন্ধানে সনাতন'
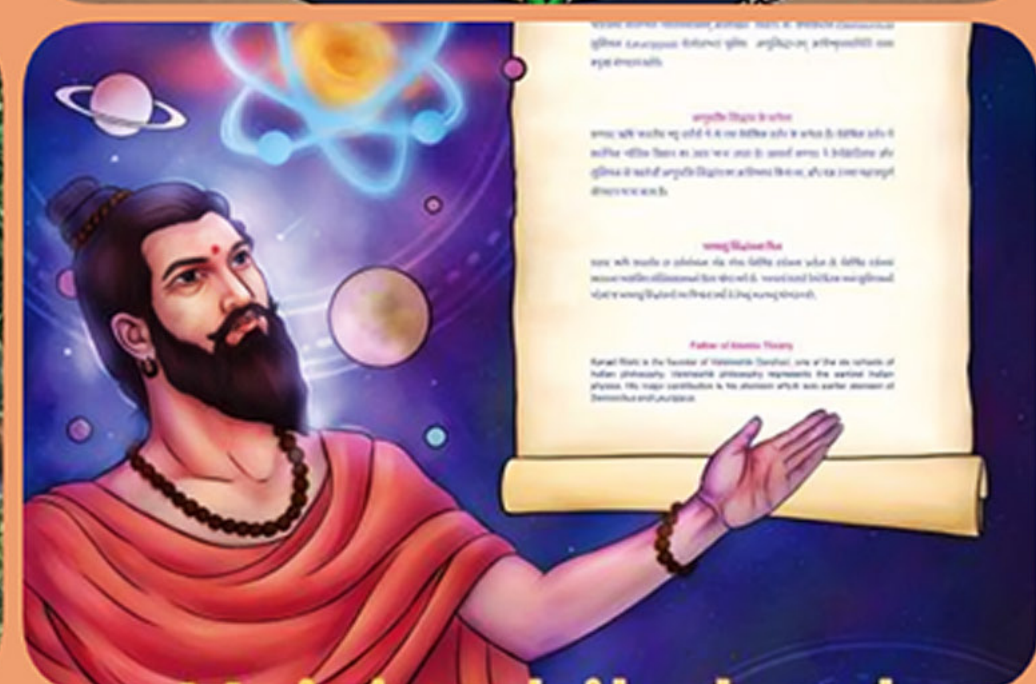
প্রকৃত ধর্মের সন্ধানে

মৃগাঙ্ক রায়
তথ্য সহায়তায় - সাত্যকি দেব

বর্তমানে অনেক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সেগুলো কি আদতে ধর্ম? অনেক নাস্তিক বলে থাকে মানুষের একটাই ধর্ম আর সেটা হচ্ছে মানবতার ধর্ম!
একটু ভাবুন তো, মানবতাই কি শুধু মানুষের ধর্ম? বেঁচে থাকার জন্য যে লড়াই করতে হয় তখন কি মানবিক চিন্তায় আবদ্ধ থাকা যায়? পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো তখন যদি সবাই শুধু মানবিক আচরণ করে যেতো তাহলে কি সেই অঞ্চলে কেউ বেঁচে থাকতে পারতো? ফসলের ক্ষতি করে এমন প্রাণীদের হত্যা করা, সমাজে উপস্থিত চোর ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসদের প্রতি কঠোর হওয়া ইত্যাদি সবই তো অমানবিক - তাই না? একারণেই, মানুষের ধর্ম শুধু মানবতা নয় প্রয়োজনে কল্যাণকর অন্য কিছু ধারণ করাও ধর্ম।

সনাতন ধর্মের ইতিহাস শাস্ত্র মহাভারত বলছে -

ধারণাদ্ধর্ম্ম মিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।

যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ সধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।

অনুবাদ: অনেকে বলেন যে ধারণ করে, সেই ধর্ম্ম ; ধর্ম্মই লোকসকল ধারণ করে অতএব যে ধারণ করে, সে ধর্ম্ম-ইহা নিশ্চয়।
(শান্তি পর্ব - ১০৬/১৪)

লোকসকল ধারণ করা বলতে এখানে বুঝাচ্ছে, সবার কল্যাণকর বিধান যা ধারণ করে তাই ধর্ম। হত্যা, লুটপাট এইসব তো লোকের কল্যাণকর নয়। কারণ এগুলোতে হিংসা রয়েছে। পরের শ্লোকেই রয়েছে -

অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।

যঃ স্যাদহিংসাসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।

অনুবাদ: ঋষিরা মনুষ্যগণের হিংসানিবৃত্তির জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব যাহা অহিংসাযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয়। (শা. প. - ১০৬/১৫)

আমাদের ধর্ম কোনো মানুষ সৃষ্টি করে নি কিন্তু অন্য যেসবকে আমরা ধর্ম বলে জানি সেগুলো সবই কোনো না কোনও মনুষ্য দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ধর্ম এভাবে সৃষ্টি হতে পারে না কারণ ধর্ম হচ্ছে কিছু বৈশিষ্ট্যধারী বিষয় বা লক্ষণ বা গুণ। যেমন - নদীর ধর্ম বয়ে চলা, জলের ধর্ম তরলতায় কিন্তু কঠিন হলেই সেটা জল না বলে বলা হয় বরফ, অগ্নির ধর্ম উত্তাপ, চুম্বকের ধর্ম আকর্ষণ ইত্যাদি। এগুলো এসবের জন্মলগ্ন বৈশিষ্ট্য কিন্তু কারোর (মানুষ) দ্বারা কোনো তত্ত্ব সৃষ্টি হলে সেটা ধর্ম নয় সেটা হয়ে যায় মতবাদ। আমাদের ধর্মেরও কিছু বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে -

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধী র্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।

অনুবাদ : ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (কেউ অনিষ্ট করলেও তার অনিষ্ট না করা; শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যকৃত অপরাধ সহ্য করা), দম (ঔদ্ধত্য না থাকা, বিদ্যাপ্রভৃতি জনিত যে উদ্ধতভাব তা ত্যাগ করা), অস্তেয় (অন্যায়পূর্বক পরধন হরণ না করা), শৌচ (আহার প্রভৃতি বিষয়ে শুদ্ধতা), ইন্দ্রয়নিগ্রহ (নিজ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ বিষয় থেকে প্রত্যাবৃত্ত করানো), ধী (প্রতিপক্ষের সংশয়াদি নিরাকরণপূর্বক সম্যক জ্ঞান লাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), [ধী ও বিদ্যা এ দুটির মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমটি কর্মজ্ঞান ও দ্বিতীয়টি অধ্যাত্মজ্ঞান], সত্য এবং অক্রোধ (যে ক্রোধ উৎপন্ন হতে পারত তা উৎপন্ন না হওয়া) এই দশটি ধর্মের লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ।
(মনুসংহিতা - ৬/৯২)
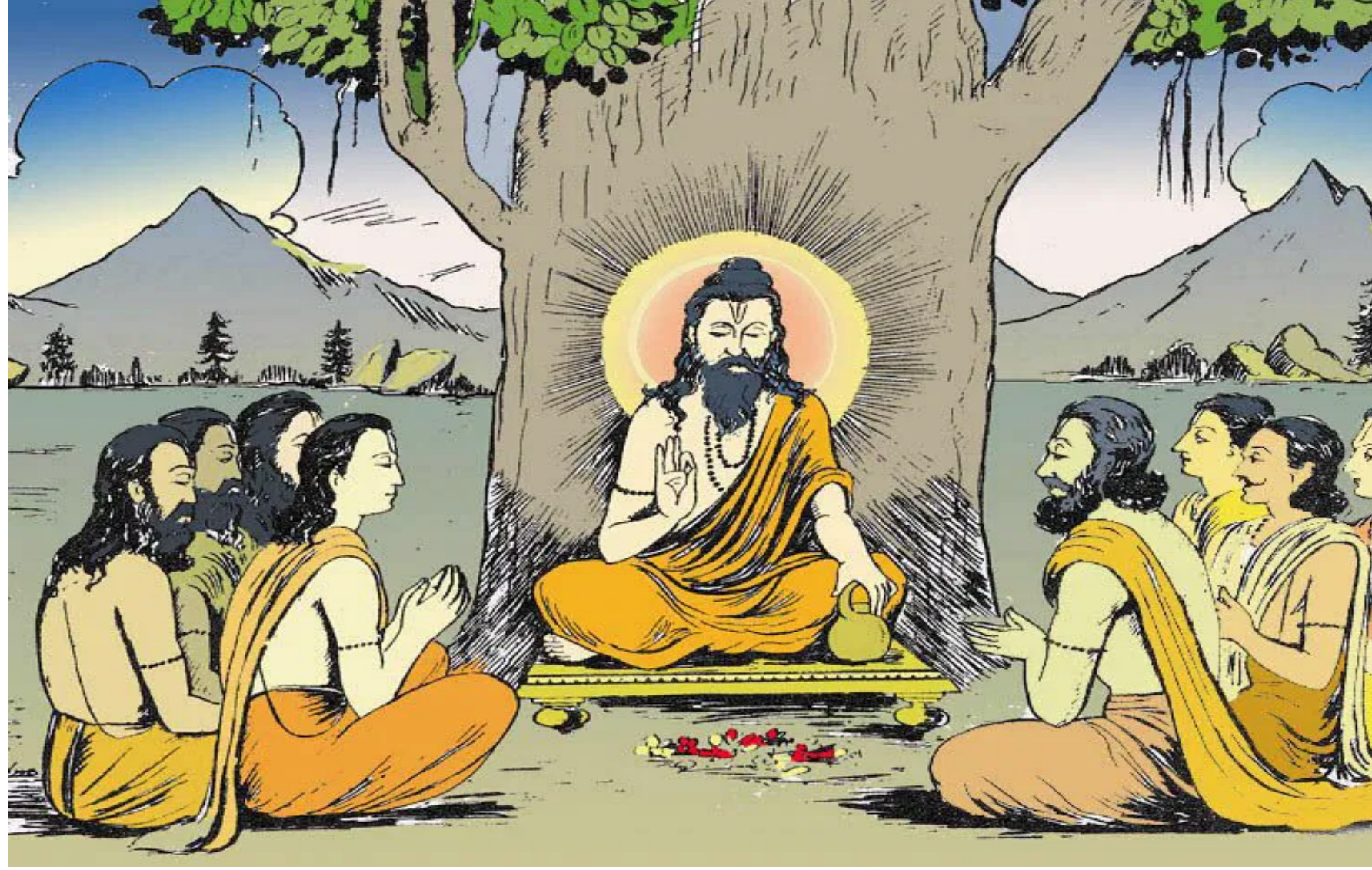
যে দশটি লক্ষণ উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো জগতের জন্য কল্যাণকর, অর্থাৎ এটুকু স্পষ্ট - ধর্মের বিধান জগতের কল্যাণের জন্যেই। কিন্তু আব্রাহামিক ধর্মগুলোর ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে সেগুলোর মধ্যে সেসব লক্ষণ দেখা যায় না এবং একারণেই সনাতন ছাড়া অন্যগুলো ধর্ম নয়। ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরেকটি বিষয় হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আর সেটাও কিন্তু সনাতন ধর্মে পাওয়া যায়। সনাতন শব্দের একটি অর্থ সত্য, ধর্মের দশটি লক্ষণের মধ্যে একটি হচ্ছে সত্য। সে হিসেবেও সনাতনই একমাত্র সত্য। সনাতন শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে চিরন্তন, সহজ করলে যা সবসময়ই ছিলো, আছে এবং থাকবে। সনাতন ধর্মের শাস্ত্রগুলো বলছে সনাতন ধর্মের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, সনাতন ধর্ম অনাদি; বিষয়টি একটু ভাবুন! কেনো অনাদি, কিভাবে সনাতন অনাদি হলো? বিষয়টি উদাহরণ দ্বারা বুঝা যাক - পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু মানুষ প্রথমে সেটা জানতো না (তারা জানতো, সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে), তাই বলে চূড়ান্ত সত্য অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বিষয়টি কি মিথ্যা হয়ে গিয়েছিলো? অবশ্যই না। আমরা কিছু না জানলেই সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে এমন নয়। সনাতন ধর্মকেও আমরা যখন জানতে পারি না তখনই মিথ্যা বা ভুল মনে হয়, মূলত সেটা আমাদের অজ্ঞতা প্রকৃত ধর্ম তথা সনাতন ধর্মের ত্রুটি নয়। ধর্ম বা সনাতন ধর্ম চিরকালই ছিলো শুধুমাত্র আমরা অজ্ঞতার বশে কিংবা মায়ার বশে জানতে পারি নি। ধর্ম কেউ (মানুষ) সৃষ্টি করতে পারে না কারণ ধর্ম হচ্ছে মূলত বৈশিষ্ট্য, তাই সৃষ্টি করা সবকিছুই মতবাদ এটাই সিদ্ধ হলো এবং সনাতন ধর্ম সবসময়ই ছিলো কিন্তু আমরা জানতে পারি নি এটাও সিদ্ধ হলো। মহাকাশের সবকিছুই ঘূর্ণনশীল এবং সূর্যের আকর্ষণের ফলে গ্রহগুলো নিজ নিজ মণ্ডলে অবস্থিত থেকে সূর্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে - এগুলো সবই আমাদের শ্রুতি শাস্ত্র বেদে বর্ণিত আছে (শুক্ল যজুর্বেদ-মাধ্যন্দিন শাখা-২০,৩৩ অধ্যায়) এমনকি আপেক্ষিক বেগের

বিষয়েও ব্র্যাকেটে দেওয়া অংশগুলোতে ইঙ্গিত রয়েছে। পূর্বে মতবাদ নিয়ে বলেছি, সেইরকম অনেক মতবাদ আমাদের ধর্মের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত বলা হয়; তবে সেগুলো হচ্ছে মূলত দর্শন। আমাদের সনাতন ধর্মে ছয়টি আস্তিক দর্শন রয়েছে, সেগুলোকে ভিত্তি করে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত ইত্যাদি দর্শন তৈরি হয়েছে কিন্তু মূলত সবগুলো একটার সঙ্গে অন্যটা সংযুক্ত। এগুলোর মধ্যে কোনোটাই ভুল নয়, সবগুলোই একই সনাতনকে উপলব্ধি করার ভিন্ন পথ মাত্র। অদ্বৈত হচ্ছে উপাসনার তাত্ত্বিক পদ্ধতি আর বাকিগুলো ব্যবহারিক পদ্ধতি। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন তাই এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হবে না।

সনাতন শব্দ কি শাস্ত্রে বিদ্যমান? (এই প্রশ্ন হয়তো অনেকের মনে জাগবে); উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ! বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেই সনাতন শব্দের উল্লেখ রয়েছে এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই সনাতন স্বীকৃত হয়েছে। স্মৃতিপ্রস্থান বা সকল উপনিষদের সার হিসেবে পরিচিত, মহাভারতের অংশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় রয়েছে -

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ।।

অনুবাদ: আপনার ঐশ্বর্য্য চিন্তার অগোচর আপনিই পরম অক্ষর পরব্রহ্ম এবং মুমুক্ষুগণেরই জ্ঞাতব্য। আপনিই এই বিশ্বের প্রকৃষ্ট আশ্রয় (যাহাতে রক্ষিত হয়, তাই আশ্রয়) । অতএব, আপনি শাশ্বত, নিত্য ধর্মের পালক, সনাতন, চিরন্তন পুরুষ। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - ১১/১৮)

সনাতন ধর্মই শ্বাশত, নিত্য এবং এই ধর্মের পালন করেন ঈশ্বর (পুরুষ)। পালন করেন মানে এই নয় ঈশ্বর সবকিছু করেন, ঈশ্বর নিয়ম সৃষ্টি করেছেন এবং সেই নিয়মেই সবাই আবদ্ধ হয়ে কর্মফল ভোগ করছে। সনাতন ধর্ম যেমন চিরন্তন তেমনি ধর্মের পালক বা পালনকর্তা ঈশ্বরও শ্বাশত, চিরন্তন বা অনাদি। ধর্ম কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নি উনার থেকেই ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে বা উনিই ধর্ম এরকম বলা যেতে পারে। সহজে বলতে গেলে ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানই ধর্ম, আবার ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে নিজেকে তৈরি করার জন্য যেসব বিধি বিধান বা নিষেধ মান্য করতে হয় সেগুলোও ধর্ম। বিভিন্ন শাস্ত্রে (বিশেষ করে পুরাণে) বলা হয়েছে, সৃষ্টির শুরুতে এইরকমভাবে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু উপরেই বলা হয়েছে সনাতন ধর্মের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, এবার হয়তো অনেকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগবেন। এ বিষয়ের সমাধান হচ্ছে - ধর্মের সৃষ্টি নেই কিন্তু জগৎ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ, জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও আমাদের ধর্ম ছিলো এবং আমরা সৃষ্টি হওয়ার পর আমরা ধর্ম সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তাছাড়া শাস্ত্রে কল্পের শুরুর বর্ণনা করা হয়েছে যেনো আমরা উপলব্ধি করতে পারি। একেক পুরাণে তাই একেকরকম বর্ণনা পাওয়া যায় কারণ একেক কল্পে একেকরকম ঘটনা ঘটে। মূলত সনাতন ধর্মের সৃষ্টিচক্রও অনাদি অর্থাৎ শুরু বা শেষ বলে কিছুই নেই।

যার আদি অন্ত নেই, যা প্রকৃতিগত ভাবেই ছিলো, আছে এবং থাকবে, যা নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে তাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম তথা বিশাল সনাতন ধর্ম।

কুম্ভমেলা কি ও কেন?

শ্রী সৌমিত্র দে

কুম্ভমেলা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের জন্য অন্যতম পবিত্র তীর্থযাত্রা। রিপোর্ট বলছে, এ বছর প্রায় চল্লিশ কোটিরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছে এই মহাস্নান যজ্ঞে। দেশ-বিদেশ, দূর-দূরান্ত থেকে পূণ্যার্থীগণ যুক্ত হয়েছেন ত্রিবেণী সঙ্গমে। ত্রিবেণী, অর্থাৎ সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনার মিলনস্থল। বেদ ও পুরাণসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সরস্বতী নদীর কথা উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে সরাসরি সরস্বতীকে নদী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা যায়, কলিযুগের প্রারম্ভেই সরস্বতী নদীর বিলুপ্তি ঘটেছে। আর্কিয়োলজিক্যাল এবং সয়েল টেস্টিং-এর বিভিন্ন রিপোর্টেও এ নদীর অস্তিত্ব সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে। তাই কলিযুগে শুধুমাত্র গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমেই পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়। এবারের কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রয়াগরাজে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুসারীদের মিলনক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত এই উৎসব। সর্বোচ্চ চার কোটি মানুষ যুক্ত হওয়ার কথা জানা যায়। কুম্ভমেলার প্রথম দিনেই চার কোটির কাছাকাছি মানুষ ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কুম্ভ মেলা মূলত চারটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়— প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী, নাসিক।
কোন বছর কোন সঙ্গমক্ষেত্রে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে, তা নির্ধারণ করা হয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তিতে।

কুম্ভমেলার সময় নির্ধারণঃ
জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা: বৃহস্পতি, সূর্য ও চন্দ্র—এই তিন গ্রহের অবস্থানের উপর নির্ভর করে মূলত এই পূণ্যস্নানের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়। বৃহস্পতি প্রতি ১২ বছরে নিজের কক্ষপথে একবার ঘুরে আসে। কুম্ভের পূণ্যস্নান মূলত সমুদ্রমন্থনের সঙ্গে যুক্ত।

সমুদ্রমন্থন কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

ত্রেতাযুগে, একবার দেবতা ও অসুরদের প্রবল যুদ্ধে দেবতারা বীরত্বের সঙ্গে জয় লাভ করেন। তখন যুদ্ধ জয়ের উল্লাসে মত্ত দেবতাদের সামনে এসে উপস্থিত হন মহামুনি দুর্বাসা। দুর্বাসার ক্রোধের ভয়ে যেখানে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড স্থবির, সেখানে দেবতারা একপ্রকার ভুলেই যান তাঁর মাহাত্ম্য। দুর্বাসা কঠোর সাধনার পরে শিবের কাছ থেকে এক দিব্য মাল্য লাভ করেন। দেবতাদের এই বিজয়ে খুশি হয়ে তিনি আশীর্বাদ স্বরূপ ইন্দ্রকে সেই দিব্য মাল্য প্রদান করতে চান।

তবে অহংকারে মত্ত হয়ে ইন্দ্র নিজের বাহন থেকে না নেমেই দিব্য মাল্যটি নিয়ে তাঁর বাহন ঐরাবতের শুঁড়ে ছুঁড়ে দেন। অহংকারী দেবতাদের মতো ঐরাবতও ওই মাল্য স্বীকার না করে, অবজ্ঞার সাথে পায়ে ফেলে পিষে ফেলে। বাকি দেবতারা এই দৃশ্যে বিচলিত না হয়ে নিজেদের উল্লাসেই মত্ত থাকেন।

ক্রুদ্ধ দুর্বাসা তখন অভিশাপ দেন,
"অহংকারী দেবগণ! আমি ঋষি দুর্বাসা, অভিশাপ দিচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে দেবলোক শ্রী ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে। সমগ্র ঐশ্বর্য ও শ্রীসম্পদ দেবরাজ্য থেকে লুপ্ত হবে!"

তৎক্ষণাৎ তাই হলো—দেবলোক মুহূর্তের মধ্যে শ্রীহীন হয়ে পড়ে। তখনই দেবতাদের অহংকারের মোহ কেটে যায়। তারা লুটিয়ে পড়েন দুর্বাসার পায়ে, কিন্তু অপমানিত দুর্বাসা কোনো কথা না শুনেই সেই স্থান ত্যাগ করেন।

এরপর শুরু হলো মূল ঘটনা—

দেবতারা শক্তিহীন হয়ে পড়ায় অসুররা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। গুপ্তচরের মাধ্যমে অসুর গুরু শুক্রাচার্য এই সংবাদ পেয়ে যান। সেই সুযোগে অসুররাও কিছু সৈন্য নিয়ে দেবলোকে আক্রমণ করে। শক্তিহীন দেবতারা অসহায় হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করেন। দেবতারা অসুরদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। অসুররা দেবলোক দখল করে ফেলল, আর দেবতারা দিশেহারা হয়ে ছুটে গেলেন পরিত্রাণের জন্য। কোনো উপায় না দেখে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে ছুটে গেলেন এবং করজোড়ে বললেন,
"প্রভু, আমাদের উদ্ধার করুন! দুর্বাসা মুনির অভিশাপে আমরা সমস্ত শক্তি ও ঐশ্বর্য হারিয়েছি। এখন অসুররা দেবলোক দখল করে ফেলেছে, আমাদের পক্ষে তাদের পরাস্ত করা সম্ভব নয়।"

ব্রহ্মা গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন এবং বললেন,
"এই সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো স্বয়ং বিষ্ণুর শরণাপন্ন হওয়া।"

এই কথা শুনে দেবতারা সবাই শ্রীহরির ধ্যান শুরু করলেন এবং তাঁকে আহ্বান করলেন। তখন বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে বললেন,
"দেবগণ, তোমাদের শক্তি ও ঐশ্বর্য ফিরে পাওয়ার জন্য সমুদ্র মন্থন করতে হবে। সমুদ্র মন্থন থেকেই তোমরা অমৃত লাভ

করবে, আর সেই অমৃত পান করলেই তোমাদের সমস্ত শক্তি ফিরে আসবে।"

কিন্তু সমুদ্র মন্থন একা শক্তিহীন দেবতাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই দেবতাদের অসুরদের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে। কারণ মন্থন করার জন্য বিশাল শক্তির দরকার, যা শুধুমাত্র অসুরদের সহায়তায় সম্ভব।

এরপর শ্রীবিষ্ণুর পরামর্শ মতো দেবতারা অসুরদের কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিলেন,
"আমরা যদি একসাথে সমুদ্র মন্থন করি, তাহলে অমৃত লাভ করা সম্ভব হবে। এই অমৃত সকলের জন্য সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া হবে।"

অসুররা প্রথমে সন্দেহ করলেও, অমৃত লাভের লোভে প্রস্তাব মেনে নিল। এরপর শুরু হলো মহাযজ্ঞ— ক্ষীর সাগর মন্থন।

মন্থনের জন্য মন্দার পর্বত ব্যবহার করা হলো দণ্ড হিসেবে এবং বাসুকি নাগকে করা হলো মন্থনের রজ্জু। দেবতারা বাসুকির লেজ ধরে টান দিলেন, আর অসুররা ধরল তার ফণা এবং শ্রী বিষ্ণু মন্থন দন্ডের ও মন্থন ক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে কূর্ম অবতার ধারণ নরেন। হরিবংশ পুরাণ মতে প্রায় এক হাজার বছর (দেবতাদের নাকি মানুষদের উল্লেখ নেই) যাবত এই মন্থন কার্য করে দেবতারা।

সমুদ্র মন্থনের সময় অনেক মূল্যবান বস্তু ও রত্ন সামগ্রী বেরিয়ে আসতে লাগল—
প্রথমেই সমুদ্র মন্থনের ফলে উঠে এলো ভয়ংকর হলাহল বিষ – যা সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে পারত। তখন মহাদেব শিব সেই হলাহল পান করেন এবং তাঁর কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করল, তাই তিনি নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হলেন।

পরবর্তী তে একে একে উঠে এলো, শঙ্খ, কমল, চন্দন, চন্দ্র, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, কৌস্তুভ মণি, পারিজাত বৃক্ষ, অন্নপূর্ণা দেবী, লক্ষ্মী দেবী – একে একে এই সমস্ত দেবদ্রব্য উঠে এলো।
সর্বশেষে ধন্বন্তরি ও অমৃত কুম্ভ –অবশেষে সমুদ্র থেকে ধন্বন্তরি উঠে এলেন, হাতে অমৃতপূর্ণ শুভ্র বর্ণের কুম্ভ (কলস) নিয়ে।

অমৃত উঠতেই অসুররা প্রতারণা করে সেটি নিয়ে পালিয়ে গেল। তখন অসুরদের আটকাতে শ্রীহরি বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করে অসুরদের মোহিত করলেন এবং কৌশলে অমৃত কলস নিয়ে দেবতাদের অমৃত পান করালেন। কিন্তু চতুর রাহু, ছিল অর্ধেক দেবতা ও অর্ধেক অসুর। না রাহুকে দেবতারা নিজেদের দলের মনে করতো না অসুরেরা। রাহু চন্দ্রদেবের রূপ ধরে অমৃত পান করতে গেলে সেটা বুঝতে পেরে মোহিনীরূপধারি বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর ধর থেকে মুন্ড আলাদা করে ফেলেন। এরপর থেকে উপরিভাগ ধরহীন রাহু হিসেবে এবং মুন্ড বিহীন কেতু হিসেবে দুই সত্ত্বার জন্ম হয়।

অন্যদিকে, অমৃত পান করার সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা তাদের পূর্বের শক্তি ফিরে পেলেন এবং অসুরদের পরাজিত করলেন।

মান্যতা আছে, যখন অমৃত কুম্ভ নিয়ে দেব-অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, তখন কুম্ভ থেকে কিছু অমৃত চুয়ে পড়েছিল পৃথিবীর চারটি স্থানে । পরবর্তীতে এই চারস্থানেই কুম্ভের আয়োজন করা হয়। এভাবেই সমুদ্র মন্থনের মাধ্যমে এই পবিত্র স্নানযাত্রার প্রারম্ভ হয়। তবে এই চারক্ষেত্রে তীর্থ ও পুণ্যস্নানের কথা বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থ যেমন, ভাগবত পুরাণ (৮ম স্কন্দ) , বিষ্ণু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বায়ু পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, বাল্মীকি রামায়ণ (বালকান্ড) এমনকি মহাভারতে অবধি কুম্ভস্নান সম্পর্কে উল্লেখিত রয়েছে। বনপর্বে পাণ্ডবদের তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে প্রয়াগরাজের কথা বর্ণিত রয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বেও মোহিনী অবতারের ছলনার কথা রয়েছে। পরবর্তীতে ইতিহাসের বিভিন্ন জায়গায় কুম্ভ মেলার আয়োজন সম্পর্কে জানা যায়। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং কুম্ভের কথা বলেছেন। এছাড়া কুম্ভমেলার আধুনিক রূপের প্রথম লিখিত তথ্য পাওয়া যায় চীনাগ্রন্থকার হিউয়েন সাং-এর বিবরণে (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ)।

তিনি উল্লেখ করেন, প্রয়াগে একটি বিশাল ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হত, যেখানে লক্ষাধিক সাধু, তীর্থযাত্রী ও রাজারা অংশ নিতেন।

গুপ্ত যুগে (৩২০-৫৫০ খ্রিস্টাব্দ) কুম্ভমেলা আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

৮ম শতাব্দীতে আদি শংকরাচার্য এই মেলার প্রচলন আরও বিস্তৃত করেন, বিশেষ করে শৈব, বৈষ্ণব ও অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে।

কিন্তু এখানে কিছু দার্শনিক মন্তব্য না রাখলেই নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমি কারও পাপও গ্রহণ করব না, পূণ্যও গ্রহণ করব না।" অন্যদিকে, রামপ্রসাদ সেন বলেছেন, "ওই শ্যামা মায়ের চরণেই আমার গয়া, কাশী তীর্থ। আমার তো তীর্থে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।"

তবে, সাধকরা এমন কথা বলেছেন বলে যে আমরা তীর্থে পূণ্যস্নানে যাব না—তা নয়। বামাখ্যাপা কিন্তু কুম্ভ স্নানে গিয়েছিলেন! শুধু তাই নয়, লক্ষ লক্ষ নাগা সন্ন্যাসী দূর-দূরান্ত, মরু ও পর্বত পাড়ি দিয়ে ছুটে আসেন এই পূণ্যস্নানে। কে কোথা থেকে খবর পান, কীভাবে আসেন, কোথায় থাকেন—এই মহাপুরুষগণ, সে সম্পর্কে তা কারও জানা নেই। যাদের শত বছরেও দেখা মেলে না, সেইসব মহামানবগণ এই মহামিলন মেলায় একত্রিত হন। এমনকি মান্যতা আছে দেবতারাও আসেন বিভিন্ন রূপ ধরে পুণ্যস্নানে অংশ নিতে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে থেকে মহাকুম্ভ :

কুম্ভমেলা সাধারণত ধর্মীয় ও পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে এটি বিজ্ঞানের আলোতেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কুম্ভমেলার সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পরিবেশবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে।

১. জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণঃ

কুম্ভমেলার সময় নির্ধারণ করা হয় গ্রহ-নক্ষত্রের নির্দিষ্ট অবস্থানের ভিত্তিতে। বৃহস্পতি, সূর্য ও চন্দ্রের বিশেষ অবস্থানকে অনুসরণ করে কুম্ভমেলার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বৃহস্পতি প্রতি ১২ বছরে একবার তার কক্ষপথ ঘুরে আসে, যা

কুম্ভমেলার মূল সময়চক্র তৈরি করে। এছাড়া প্রতি ১৪৪ বছরে সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি এক সরলরেখায় অবস্থান করে, যা মহাকুম্ভমেলার সময় নির্দেশ করে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই সময়টিতে ভূ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটে, যা শরীর ও মনের উপর প্রভাব ফেলে। নদীর জলেও কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, যা ঐতিহ্যগতভাবে 'পবিত্র জল' হিসেবে বিবেচিত হয়।

২. জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: গঙ্গার পানির বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ

গঙ্গার জল নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, গঙ্গার জলে একটি বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিওফাজ (Bacteriophage) রয়েছে, যা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে পারে। ফলে এই জল দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করেও বিশুদ্ধ থাকে।

ব্রিটিশ গবেষক ড. ফ্রান্সিস হ্যামিল্টনের গবেষণায় দেখা গেছে, গঙ্গার জলে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি মাত্রায় অক্সিজেন রয়েছে, যা এটিকে আরও বিশুদ্ধ রাখে। এছাড়া কুম্ভমেলার সময় লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশের ফলে 'কোয়ান্টাম বায়োলজি' (Quantum Biology) অনুযায়ী পরিবেশে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে, যা মানুষের মন ও শরীরের উপর প্রভাব ফেলে।

৩.

মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণঃ

কুম্ভমেলা একটি বিশাল সামাজিক সমাবেশ। এত বিপুল মানুষের একত্রিত হওয়া এবং ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত মানসিক প্রশান্তি মানুষের মস্তিষ্কে বিশেষ নিউরোকেমিক্যাল (Neurochemical) পরিবর্তন ঘটায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধর্মীয় উৎসবের সময় মানুষের শরীরে ডোপামিন ও সেরোটোনিন নামক 'হ্যাপি হরমোন' নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি করে। এছাড়া বিপুলসংখ্যক মানুষের একসঙ্গে থাকা 'সোশ্যাল সাইকোলজি' (Social Psychology)-তে বিশেষ প্রভাব ফেলে, যা সমাজের স্থিতিশীলতা ও সংহতিকে বৃদ্ধি করে।

৪. পরিবেশগত প্রভাবঃ
কুম্ভমেলার সময় নদীর পানি বিশুদ্ধ রাখতে প্রশাসন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ একসঙ্গে নদীতে স্নান করলেও জলের স্বাভাবিক জীবাণুনাশক ক্ষমতা ও প্রবাহমানতার কারণে দূষণ তুলনামূলকভাবে কম হয়। এছাড়া এই সময়ে নদীতে প্রবাহমান জলে নতুন খনিজ পদার্থ যুক্ত হয়, যা আশপাশের পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।
বিজ্ঞানীরা এও মনে করেন, ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে শরীরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আয়ুর্বেদ মতে, শীতল জলে স্নান শরীরের দাহ দূর করে এবং মানসিক প্রশান্তি দেয়। এছাড়া মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে 'হার্ড ইমিউনিটি' (Herd Immunity) গঠিত হয়, যা ভবিষ্যতে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।

কুম্ভমেলা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও পরিবেশবিজ্ঞানের এক অনন্য সংমিশ্রণ। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করছে যে, এই মহাযজ্ঞ শুধুমাত্র বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না, বরং এর পেছনে গভীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও রয়েছে।

বিজ্ঞানে "Metalastic" এবং "Antimetalastic" বলে দুটি শব্দ রয়েছে। এই দুটি বস্তু কাছাকাছি আসলে মহাধ্বংস করে, আবার একত্র হলে অমূল্য বস্তুর সন্ধান দেয়। তেমনি ভাবেই দেবতারা Metalastic-এর প্রতীক। যেমন: অগ্নি, বায়ু, জল এগুলো মেটালাস্টিক। অন্যদিকে অসুররা রিপ্রেজেন্ট করে মনের মধ্যে থাকা অহংকার, কপটতা, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, ধ্বংস। এর বিপরীতে থাকলে হয় ধ্বংস কিন্তু একত্র হয়ে সমুদ্র মন্থন করলে উঠে আসে অমূল্য সম্পদ। দেবাদিদেবের দিব্য মাল্যকে অপমান করে দেবতাগণ, সেই দেবাদিদেব মহাদেব হলাহল পান করে হন নীলকণ্ঠ। এ উৎসবে জাতি বর্ণ ধনী গরীব নির্বিশেষে পূণ্যার্থিরা অংশ নিয়েছে। মানুষ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দেখে বুঝতে পেরেছে এই মোহের জগতের কোন মূল্য নেই। এই মিলনমেলা প্রত্যেকটা সনাতনীর জন্য গর্বের ও ঐতিহ্যের।

"হর হর শম্ভু"

বেদ হতেই বেদমাতা সরস্বতী

বৃহদ্রথ সান্যাল
তথ্য সহায়তায় - সাত্যকি দেব

মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথির পূর্বাহ্নে বেদমাতা সরস্বতীর পূজা হয়ে থাকে। দেবী হচ্ছেন মহামায়ার একটি অন্যতম রূপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্ভুক্ত শ্রী শ্রী চণ্ডীতে রয়েছে -

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।।

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।।

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।।

অনুবাদ:
তিনি প্রসন্না হইলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন। তিনি সংসার-মুক্তির হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিণী ও সনাতনী। তিনিই সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী। (শ্রী শ্রী চণ্ডী ১/৫৬-৫৮)

বিদ্যা দানকারী মাতা মহামায়ার এই রূপকে বেদমাতাও বলা হয়ে থাকে। মাতা সরস্বতী বৈদিক দেবী হিসেবে পূজিত হন। বেদে মায়ের বিষয়ে বর্ণনা ও স্তুতি রয়েছে।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতংতি সুমতীনাম্।

যজ্ঞং দধে সরস্বতী।।

অনুবাদ: সরস্বতী দেবী শোভন ও সত্যস্তুতির প্রেরণাদাত্রী, মানবের শোভন
চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেন; তিনি যজ্ঞকে ধারণ করেছেন।
(ঋগ্বেদ - শাকল শাখা - ১/৩/১১)
দেবীর প্রতি এখানে মানুষের চেতনা জাগ্রতকারী হিসেবে প্রার্থনা করা
হচ্ছে। মূলত এই চেতনা বিদ্যার প্রতি চেতনা। বিদ্যা হচ্ছে
যা ব্রহ্ম সম্পর্কিত জ্ঞান। দেবীর সম্পর্কে সামবেদেও স্তুতি রয়েছে

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।

যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ।।

অনুবাদ: যিনি আমাদের পবিত্রকারিণী, যিনি অন্নপানে বলশালিনী হয়েন,বুদ্ধির সাহিত্যে যিনি সম্পত্তির নিদান,সেই বাণীদেবী যজ্ঞ নির্ব্বাহ করুন।
(সামবেদ - কৌথুম শাখা - ২/২/৫)

বেদে মাতা সরস্বতীর দুটো রূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি রূপ হচ্ছে বিগ্রহ স্বরূপা এবং অন্যটি হচ্ছে নদীস্বরূপা।

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা।

ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি।।

অনুবাদ: দেবী (নদীস্বরূপা) সরস্বতী প্রবাহের দ্বারা জলের প্রাচুর্যকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেন এবং যারা উনার বিগ্রহরূপে বিশেষভাবে অনুষ্ঠান করেন তাদের সমস্ত বুদ্ধিকে আলোকিত করেন। অর্থাৎ, তাদের(যজমান) অনুষ্ঠান সর্বদা বস্তুনিষ্ঠ বুদ্ধিমত্তার জন্ম দেয়।
(ঋগ্বেদ - শাকল শাখা - ১/৩/১২)
তবে বর্তমানে অনেকেই শুধু নদীস্বরূপা হিসেবে গ্রহণ করেন যা ভুল হিসেবেই বিবেচ্য। কারণ বেদ মন্ত্রের অর্থ বিচার করতে হয় বেদাঙ্গের দ্বারা। ছয়টি বেদাঙ্গের অন্যতম নিরুক্তে (যাকে বৈদিক অভিধান বলা হয়) এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে -
"তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি..."

অর্থ - সরস্বতী' এই নাম বাঙ্ নামসমূহের অন্যতম। কিন্তু এমন বৈদিক মন্ত্র আছে, যাহাতে সরস্বতী শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে—'নদী' অর্থে এবং 'দেবতা' অর্থে।
(নিরুক্ত - ২/২৩/৩, খণ্ডাংশ)

নিরুক্তের পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে নদীস্বরূপা মা সরস্বতীর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও বিগ্রহস্বরূপা মাতা সরস্বতীর বিষয়ে নিরুক্ত ১১/২৬-২৭ এ বিস্তারিত রয়েছে। যারা মায়ের বিগ্রহ রূপ অস্বীকার করেন তাদের ধারণা যে ভুল সেটা বেদাঙ্গ বিচারে প্রমাণিত।

জয় মা সরস্বতী

‘হিন্দু ধর্ম ও বাংলা ভাষা’

লেখকঃ শ্রীঅপূর্ব মোদক চৌধুরী

তথ্য সংগ্রহে সহায়তাঃ বৃহদ্রথ স্যানাল

বর্তমানের কিছু মরুর মত পালনকারী যারা একাদশ শতাব্দীতে এই বঙ্গে বহিরাগত হিসেবে এসেছে তাদের কিছু উদ্ভট দাবি সচরাচর দেখা যায়। তার মধ্যে অন্যতম হলো সেনযুগে হিন্দু ব্রাহ্মণেরা নাকি বঙ্গভাষায় তথা বাংলা ভাষায় কথা বলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তারপর মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিরা নাকি ত্রয়োদশ শতকে আক্রমণ করে সেন শাসক লক্ষ্মণসেনকে হারিয়ে সকলকে বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

বস্তুত পক্ষে বাংলাদেশের যে তথাকথিত ইতিহাসবিদ রয়েছেন যারা প্রামাণ্যবাদের তোয়াক্কা না করে শুধু নিজের মনোকল্পিত কথা বার্তা বলতে থাকে হয়তো তারা কখনো সনাতন ধর্ম সম্পর্কে অবগত নন অথবা নিজ মতবাদের দ্বারা দূষিত মনভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এইসব কথা বার্তা বলে বেড়ান। বরং সতেরো দশকের কবি আবদুল হাকিমের রচিত নূরনামা কাব্যে প্রাপ্ত বঙ্গবাণী কবিতা থেকে জানা যায় যে হিন্দুর অক্ষর হওয়ায় বাংলা ভাষাকে মুসলিম সমাজ অবজ্ঞা করত। এককালীন যারা বাংলা ভাষাকে হিন্দুর অক্ষর বলত আজ তারাই উল্টো বাংলা ভাষাকে হিন্দু বিরোধী ভাষা হিসেবে প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ প্রয়াসে তৎপরতা চালাচ্ছে।

হিন্দু ধর্ম বস্তুত পক্ষে কোন ভাষাকেই অবজ্ঞা করে না বরং প্রত্যেক অক্ষর ও ভাষা, বাক্য ও পদ দেবীস্বরূপে পূজিত হন। এই বিষয়ে ললিত সহস্রনামের উদাহরণ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। ললিত সহস্রনামে ৬৭৮ তম নামে দেবী ললিতাকে “ভাষারূপা” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষারূপার অর্থ যিনি সমস্ত ভাষার স্বরূপ অথবা সমস্ত ভাষা যার একমাত্র স্বরূপ। উক্ত নামের ভাষ্যে ভাষ্কর রায় কর্তৃক সৌভাগ্যভাস্কর ভাষ্যে বলা হয়েছে যে,

“সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি ভাষা যাঁহার স্বরূপ । ভাষার বিভিন্ন রূপ রয়েছে। অথবা বিভিন্ন ভাষার দ্বারা উনার পূজা করা হয়। উল্লেখ আছে- ‘কেউ সংস্কৃতে,

কেউ ম্লেচ্ছ ভাষায়, কেউ
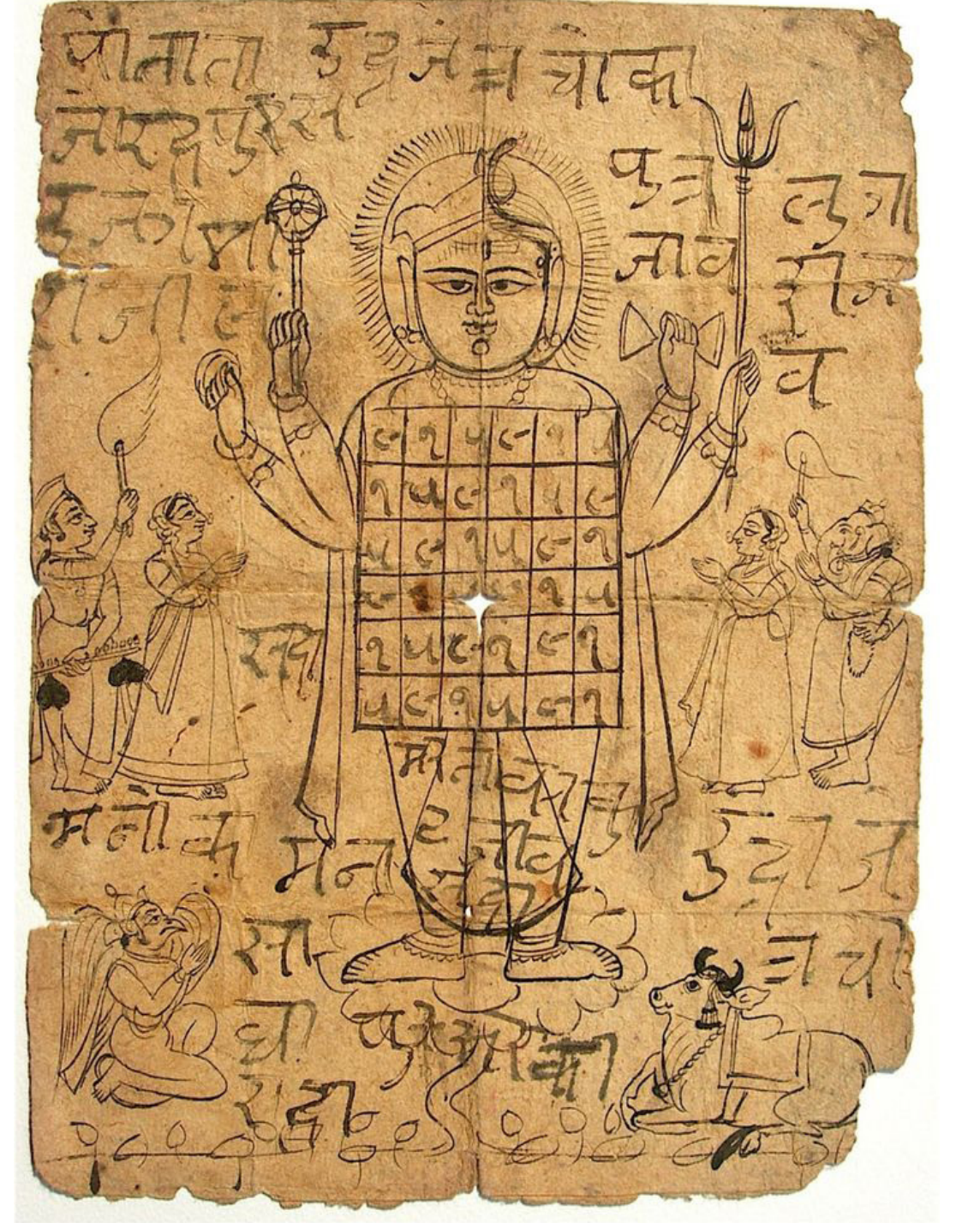
প্রাকৃত ভাষায় এবং কেউ কুৎসিত ভাষায় পূজা করে।”

শুধু তাই নয় কৃষ্ণযজুর্বেদীয় সরস্বতী রহস্য উপনিষদের তৃতীয় শ্রুতিতে উল্লেখ আছে,”যা বর্ণপদ বাক্যর্থ..... মাং পাতু সরস্বতী” - যিনি বর্ণ,পদ, বাক্য ও তদর্থরূপে বিদ্যমান সেই অনাদি নিধনা উৎপত্তিনাশশূন্যা, অনন্তা শ্রীসরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

হিন্দু ধর্ম এমন এক ধর্ম যেখানে সকল ভাষা দেবী সরস্বতী,কালী ও ললিতাম্বিকার স্বরূপ হিসেবে পূজিত হন সেখানে কেন হিন্দুরা বাংলা ভাষার শত্রু হবে!? যেই সেনযুগকে বাংলার শত্রু বলে প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয় সেই সেনযুগে লিখিত কাব্যগ্রন্থ সদুক্তিকর্ণামৃতে পাওয়া যায় উল্টো কথা। সদুক্তিকর্ণামৃত লক্ষ্মণসেনের (আনু. ১১৭৮-১২০৬ খ্রি) ২৭তম রাজ্যাংকে ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খ্রি) শ্রীধরদাস সংকলিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ।

উক্ত কাব্যে বাংলাভাষার স্তুতি করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ঘন রসপূর্ণ, গম্ভীর, বাঁকা অথচ মধুর, কবিদের জীবনধারণের উপায়, গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য এবং গঙ্গার ন্যায় পবিত্র এই বঙ্গভাষা।

(সদুক্তিকর্ণামৃত - উচ্চবাচপ্রবাহ / বাণী / ২ অথবা ৫/৩১/২

অথবা ২১৫২ তম শ্লোক)

যেই ভাষাকে সেনযুগে গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলা হলো সেই সেনযুগেই বাংলা ভাষা উচ্চারণ করলে বা শুনলে নাকি রৌরব নরকে গমন করবে এই ধরনের মনোকল্পিত বার্তালাপ এক ধরনের মূর্খতা ছাড়া আর কি বলা যায়? দাবিকৃত ব্যক্তির বস্তুত পক্ষে কখনো রৌরব নরকের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল বলে মনে হয় না!

রৌরব নরকে কোন পাপের ফলে গমন করে তা বিষ্ণুভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে ,"যে ব্যক্তি 'এই শরীর আমি ও এই ধনসম্পত্তি, স্ত্রী আমার' এইরূপ মনে করে অন্য সকলের সাথে কলহ করে এবং শুধু নিজ আত্মীয় পরিজনকে নিরন্তর পোষণ করে সে মৃত্যুর পর নিজ পাপের জন্য রৌরব নরকে পতিত হয়।" (বিষ্ণুভাগবত - ৫/২৬/১০)। বস্তুত পক্ষে রৌরব নরক গমনের সাথে প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট কোনো ভাষা বলা বা না বলার উপর নির্ভরই করে না।

তাই পরিশেষে বলা যায়, বাংলা ভাষা হিন্দুদের নিকট গঙ্গার ন্যায় পবিত্র। বাংলা ভাষায় প্রচলিত পঞ্চাশ বর্ণ স্বাক্ষাৎ ভগবতী শারদা। বাংলা ভাষা একটি হিন্দুয়ানী ভাষা। তাই যারা বাংলা ভাষাকে হিন্দুর শত্রু করার মনোভাব নিয়ে বসে আছেন তাদের সেই সব দাবি শুধু প্রমাণহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তথ্য সংগ্রহঃ

১) সদুক্তিকর্ণামৃত - সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী
২) ললিত সহস্রনাম স্তোত্র (সৌভাগ্যভাস্কর) - Shri Bharat Bhushan
৩) ললিত সহস্রনাম স্তোত্র - Ramamurthy N
৪) কৃষ্ণযজুর্বেদীয় সরস্বতীরহস্যোপনিষদ - শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ
৫) বিষ্ণুভাগবত - গীতাপ্রেস

তন্ত্র ও তন্ত্রের সাধন (পর্ব–১)

গোপীনাথ ঘোষ

দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কর্মতে সর্বোচ্চ স্তরের পূর্ণতা অর্জনের জন্য চলমান প্রচেষ্টাকে সাধনা বলা হয়ে থাকে। সরল ভাষায় বললে প্রত্যেক ব্যক্তি তার জীবনের কোনো না কোনো বিষয়ের উপর দক্ষতা বা সফলতা অর্জনের জন্য গভীরভাবে যে কর্ম করেন সেটাই তার সাধনা। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে কোনো না কোনো লক্ষ্য থাকে, তারা তা অর্জনের জন্য সাধনা করে থাকেন। তবে সাংসারিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য আর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য ভিন্ন হয়ে থাকে তাই তাদের সাধনার ধরনও ভিন্ন হয়ে থাকে।

আধ্যাত্মিক শিক্ষক, যোগী, সাধক উনাদের মতে - 'জীবনের সবকিছুই সাধনা হতে পারে। আপনি যেভাবে খাবেন, যেভাবে বসবেন, যেভাবে দাঁড়াবেন, যেভাবে আপনি শ্বাস নেবেন, আপনার শরীর, মন এবং আপনার শক্তি ও আবেগগুলি পরিচালনা করবেন - এটি সাধনা। সাধনা মানে কোন নির্দিষ্ট ধরনের ক্রিয়াকলাপ নয়, সাধনা মানে আপনি আপনার সুস্থতার জন্য জ্ঞান অর্জনের জন্য সবকিছুকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন।'

এক এক জনের সাধনা এক এক রকম হয়ে থাকে। কেউ তার জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য, কেউ তার জীবনে সর্বোত্তম জ্ঞান লাভের জন্য আবার কেউ মোক্ষ লাভের জন্য সাধনা করে থাকেন।

অধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখবেন কেউ বছরে একবার নির্দিষ্ট কোনো দিনে সাধনা করেন তারাও সাধক আবার কেউ প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কোনো তারিখে সাধনা করে, কেউ বা নির্দিষ্ট কোনো বারে সাধনা করেন তারাও সাধক। এইভাবে তাদের সাধনার মাধ্যমে তারা কোন পর্যায়ের সাধক তা বোঝা যায়। সাধনাকে যদি আমি কঠোর অনুশীলন বলি তাও কিন্তু ভুল নয়। যেমন ধরুন সামনে মহা শিবরাত্রি সবাই বছরের শুধু মাত্র কেবল এই দিনেই মহাদেবের সাধনা করেন। তাই তাদেরকে শুধু এই দিনটির জন্য সাধক বলা চলে। আবার মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে শিবরাত্রি হয় যাকে মাসিক শিবরাত্রি বলা হয় এই দিনে যারা সাধনা করে তারাও সাধক আবার যারা প্রতিদিন সাধনা করেন তাদেরকেও সাধক বলা হয়; শুধুমাত্র সাধনার পদ্ধতির পার্থক্য।

[বি.দ্রঃ এখানে আমি উদাহরণ হিসেবে শিব সাধনার কথা বলেছি এছাড়াও আরো আছে যারা শাক্ত তারা মায়ের সাধনা করেন, যারা বৈষ্ণব তারা তারা বিষ্ণুর সাধনা করেন আবার যারা স্মার্ত তারা সকল দেব দেবীর সাধনা করেন বিশেষ বিশেষ তিথি অনুযায়ী।]

এইখানে আমি সাধনা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছি।

সাধনার মধ্যে সবথেকে অন্যতম হলো শাস্ত্রে বর্ণিত তন্ত্র সাধনা। তার আগে এটা কি সেটা বুঝতে হবে সবাইকে কারণ এটা নিয়ে অনেকের ভিতর অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আমাদের আগে বুঝতে হবে তন্ত্র কি? তন্ত্র সাধনা বিষয়টা কি? তন্ত্র Black Magic, ভোজবাজী বা যাদুবিদ্যা নয়; তন্ত্র অধ্যাত্মজীবনের পথচারী, মুক্তি ও পরমশান্তির পথ নির্দেশক এবং তন্ত্রসাধনা জীবনে নিয়ে আসে অনির্বাণ-আলোকের মতো শাশ্বত-আনন্দ। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বলেছেন -

'অঘটন আজও ঘটে সংসারে ও মনুষ্য-জীবনে, কিন্তু তারজন্য তন্ত্র ও তন্ত্রের প্রভাব দায়ী নয়। আমরা জানি, আভিচারিক প্রয়োজনে তন্ত্রের অনুষ্ঠান করেন অনেকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কিন্তু তন্ত্রসাধনার জগতে তা' চিরদিনই নিন্দনীয়।' আত্যুদায়িক-প্রয়োজনেই কল্যাণকামী সাধকেরা তন্ত্রের সাধনা করেন এবং তন্ত্রের আত্যুদায়িক-প্রয়োজনই আদরনীয় সমাজে ।

তাছাড়া এই প্রসঙ্গে বলি, তন্ত্রসাধনা যদিও অনুষ্ঠান ও তত্ত্বমূলক, তবুও ব্যবহারিক বা practical সাধনা নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ও অনুভূতি ছাড়া নিস্ফল ও নিরর্ধক। তন্ত্র মূলত গূঢ় যোগতত্ত্ব, মন্ত্র, ধ্যান ও শক্তির উপাসনার মাধ্যমে আত্মসিদ্ধির পথ। এই সাধনার দ্বারা জীব সাধনার উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারে। তাছাড়া, তত্ত্বের যথাযথ অর্থের ও ভাবের অবগতির তথা জ্ঞানের মহিমা ও আনন্দকে নিয়ে তন্ত্রসাধনার যথার্থলক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে তন্ত্রসাধনা করা উচিত।

তন্ত্র সর্ম্পকে আরও ভালোভাবে বুঝতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উনার লেখা একটি গ্রন্থ 'তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা' তে দেখা যায় তন্ত্র'-শব্দের সাধারণ অর্থ তাই যে জ্ঞানের বিস্তারসাধন করা– 'তনোতি বিস্তারং কবোতি', অথবা 'তনাতে বিস্তার্যতে জ্ঞানং অনেন ইতি তন্ত্রম্' অথবা 'তনোতি বিপুল' অর্থং তত্ত্ব-তন্ত্র-সমন্বিতম্, এনঞ্চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্র ইত্যভিধীযতে। তন্ত্রশাস্ত্রে থাকে যেমন তার অর্থ, তত্ত্ব ও মন্ত্রের বিষয়নির্ধারণের সার্থকতা, তেমন তন্ত্রে "মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ" -মন্ত্রাধিপতি দেবতার সঙ্গে মনের ঐক্যসাধন করে জপ করলে মন্ত্র সাধকের অজ্ঞানপাশ মুক্ত করে। বঙ্গদেশীয় সাধক পূর্ণানন্দনাথ তাঁর 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি'-গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকাশে (অধ্যায়ে) ১৫৬-১৫৭ শ্লোকদুটিতে মন্ত্রের অর্থ ও সার্থকতা সম্বন্ধে বলেছেন—

'মননাৎ-ত্রাণাচ্চৈকাদ্বযস্যাববোধনাৎ।

মন্ত্র ইত্যুচ্যতে সম্যক শিবাধিষ্ঠিতোহপি চ। গপ্তোপেদেশতো মন্ত্রো মননাৎত্রাণনাদপি।

তেন মন্ত্র ইতি প্রোক্তো দেশিকেস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥'

"মন্ত্রস্য দশ-সংস্কারাঃ কথ্যতে তন্ত্রবর্ত্মনা জনন জীবনং পশ্চাৎ জ্ঞানং বোধনং তথা ||"

তারপর আছে অভিষেক প্রভৃতি। কুলার্ণবতন্ত্রেও এ'সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তাছাড়া শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে ষটচক্রের শ্রীবিদ্যাসাধনার অতিসুন্দরভাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রঃ)।

তন্ত্রের যা প্রধান উদ্দেশ্য, সেই তত্ত্বের ও মন্ত্রের বিষয়নির্ধারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তন্ত্রে। মোটকথা শব্দের সঙ্গে অর্থের কি

সম্বন্ধ 'তত্ত্ব' বলতে কি বোঝায় এবং মন্ত্রের দেবতা ও মন্ত্রের সার্থকতা কি-তন্ত্র সেই সকলের পরিচয় প্রদান করে সাধকের জীবনকে উন্নত করার জন্য। 'তত্ত্ব' অর্থে শিব-শক্তি-তত্ত্ব এবং প্রকৃতি-তত্ত্বের পরে পুরুষতত্ত্ব। পুরুষের পাঁচটি কঞ্চুক বা উপাধি (আবরণ), কলা, রাগ, বিদ্যা, কাল ও নিয়তি। এই উপাধিগুলিব সৃষ্টি হয় কার্যমায়া থেকে। কার্যমায়া থেকে সৃষ্টি হয় ভ্রম। ভ্রমই শক্তিকে শিব থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করে। কার্যমায়ার পরে কারণমায়া শুদ্ধবিদ্যা, শুদ্ধবিদ্যাই জ্ঞান। এই শুদ্ধবিদ্যারূপ জ্ঞান থেকে 'অহং' ও 'ইদং', বিষয় ও বিষয়ী-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান জন্মায়। 'অহং' ও 'ইদং', অথবা অহন্তা ও ইদন্তা জ্ঞানের বিশ্লেষণই উপলব্ধি আনে শিবের বা ঈশ্বরজ্ঞানের। ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান এককথা। ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াময়ী বিমর্শশক্তি মহাপ্রকৃতি এবং প্রকাশময় শিব যে এক ও অভিন্ন এই সামবস্যোপলব্ধিব দ্বার উন্মুক্ত করে। এই সামরস্যের উপলব্ধির নামই তন্ত্রে মুক্তি, কৈবল্য বা নির্বাণ।
বিষয়টা আরও সহজভাবে যদি বলি তাহলে বলবো প্রকৃতি তার নিজের স্বভাব কে শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে, এই শব্দই মন্ত্র। প্রচলিত অর্থে বলা যায় জীবের জগতের নিজের বাসনা কে ব্যক্ত করবার অন্যতম একটি মাধ্যম হলো শব্দ অর্থাৎ মন্ত্র ,মনের সংকল্প কে বাহ্যিক ভাবে রূপ দেয়ার মাধ্যমকে মন্ত্র বলা হয়। আর মন্ত্রের সাথে প্রকৃতি, বস্তু, প্রাণী বা গাছের (জীব বা জড়) সন্নিবেশ করে যে সংকল্প রচনা করা হয় তাকে তন্ত্র বলে, তবে তন্ত্র নির্দিষ্ট মন্ত্র ছাড়াও সম্পন্ন হতে পারে। মন্ত্র ও তন্ত্রে সংকল্প ই প্রধান বিষয়। আধ্যাত্মিক অর্থে মনের ত্রাণ বা মুক্তিকে মন্ত্র আর দেহের মুক্তি বা ত্রাণ কে তন্ত্র বলা হয়ে থাকে।

আধ্যাত্মিক সাধনার উন্নতির ক্ষেত্রে তন্ত্র একটি বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। "কলি যুগে তন্ত্র সাধনাই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনা"-এই বক্তব্য বহু আধুনিক তন্ত্রগ্রন্থের শুরুর কথা। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-এর 'বৃহৎ তন্ত্রসারঃ' গ্রন্থটি তন্ত্র-পণ্ডিতদের কাছে আকরগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। গ্রন্থটির ভূমিকাতেই বলা হয়েছে, "সর্বশাস্ত্র অপেক্ষা তন্ত্রশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। মৎস্যসূক্তে লিখিত আছে-যেরূপ দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্বতের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, রাজার মধ্যে ইন্দ্র, দেবীর মধ্যে দুর্গা, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সর্ব্ব শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্র শাস্ত্র প্রধান।" এই শহরেরই এক শ্রদ্ধেয় নাট্যকার বলেছিলেন - "সত্য ততটাই প্রকাশিত হয়, যতটা আমরা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাই।" কথাটা হয় তো ঠিক এ'রকম, অথবা একটু অন্য রকম; কিন্তু অর্থটা একই। কথাটা মনে গেঁথে গেছে। সত্যি। কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যমেধার মানুষদের কথা মাথায় রেখে বিচারে বসলে মনে হয়- কথাটা আংশিক সত্যি। উপরের বিচার হচ্ছে - ন হি নিন্দা ন্যায় বিচার, সব শাস্ত্রই নিজ স্থানে শ্রেষ্ঠ - এরকম চিন্তা রেখেই তন্ত্র সম্পর্কিত সাধারণ পরিচয় জ্ঞান অর্জন করবেন এতটুকুই আশা।

(বাকি আলোচনা পরবর্তী সংখ্যায়)...

জয় সনাতন

জয় মহাকাল
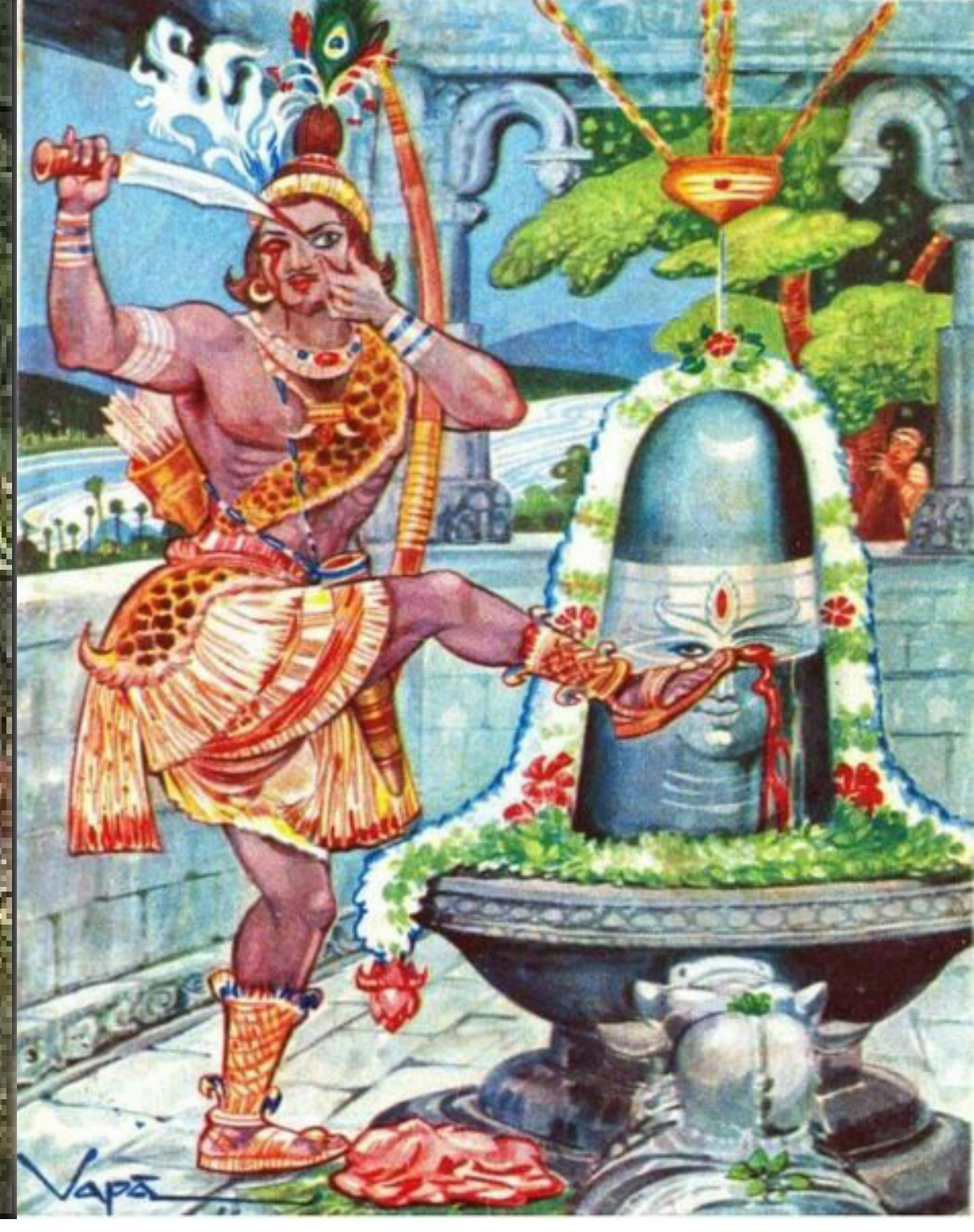
কান্নাপ্পার শিব ভক্তি

তথ্য সংগ্রহ ও সম্পাদনায় - মৃগাঙ্ক রায়
তথ্য সহায়তায় - সাত্যকি দেব

কান্নাপ্পা নয়নার হলেন একজন দক্ষিণ ভারতীয় শিব ভক্ত সাধু। যিনি তামিলে থিন্নান নামে অধিক পরিচিত। তিনি শ্রী কালহস্তের কাছে উদুপ্পুরে (বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের উতুক্কুরুতে) এক ব্যাধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কান্নাপ্পার বাবার নাম রাজাতন নাগা (Rajatan Nagan) বা রাজা নাগা এবং মাতার নাম থাত্থাই (Thaththai)। রাজাতন নাগা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের এক বংশগত শিকারি (ব্যাধ) সম্প্রদায়ের নেতা শ্রী কার্তিকেয়ের ও মহাদেবের একজন ভক্ত। তার পিতামাতার দ্বারা তার নাম ছিল দিনা, যা আজ তামিল ভাষাভাষীদের কাছে যথাক্রমে থিন্নান নামে পরিচিত।

অর্জুন যখন পাশুপত লাভের জন্য শিবের ধ্যান করছিলেন, তাকে পরীক্ষা করার জন্য, শিব সেই জঙ্গলে পশু শিকারী হিসাবে প্রবেশ করেন এবং শিব ও অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। পরমেশ্বর এর দিকে যতবার অর্জুন তীর নিক্ষেপ করে ততবারই তার তীর বিফল হতে থাকে কিন্তু অর্জুন হার না মেনে যুদ্ধ করেন, যখন তাঁর সব প্রচেষ্টাই বিফল হয় তখন অর্জুন মায়া কাটিয়ে মহাদেবকে চিনতে পারেন এবং অবশেষে অর্জুনের প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে পরমেশ্বর শিব তাকে পাশুপতের জ্ঞান দান করেন। একটি মত অনুযায়ী মহাদেবের আশির্বাদে পরবর্তীতে অর্জুনই কান্নাপ্পা নয়নার নামে আবারো জন্মগ্রহণ করেন এবং অবশেষে শিব কৃপায় মহাদেবের সাথে লীন হয়ে যান।

কান্নাপা থিন্না হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীকালহস্তেশ্বর মন্দিরের বায়ু লিঙ্গের পূজা করতেন। কথিত আছে এই শিব লিঙ্গ উনি শিকার করার সময় বনে পেয়েছিলেন। একজন শিকারী হওয়ার কারণে তিনি ভগবান শিবের উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বলা হয় তিনি স্বর্ণমুখী নদী থেকে মুখে করে জল এনে শিব লিঙ্গ ধুয়ে দিতেন, যেনো শিবলিঙ্গ পরিষ্কার থাকে। তিনি ভগবান শিবকে শুয়োরের মাংস সহ যে কোনও শিকার করা প্রাণীর মাংস মহাদেবকে উৎসর্গ করতেন। সকল সুখ দুঃখের কথা মহাদেবের কাছে বলতেন।

তখনকার অনেক পুরোহিত এসবের বিরোধিতা করলেও ভগবান শিব তার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছিলেন কারণ থিন্নার হৃদয় ছিলো বিশুদ্ধ ভক্তিতে পূর্ণ। মহাদেব একদিন তাঁর প্রিয় ভক্ত থিন্নার প্রভুভক্তির পরীক্ষা নিতে মহাদেব নিজের ঐশ্বরিক শক্তিতে, তিনি একটি কম্পন সৃষ্টি করেন এবং মন্দিরের ছাদটি পড়ে যেতে থাকে। থিন্না ছাড়া সমস্ত পুরোহিত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সে (থিন্না) লিঙ্গটিকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য তার শরীর দিয়ে ঢেকেছিলেন। তাই তার নামকরণ করা হয় ধীরা (বীর)।

আকবর থিন্না কৃত আচার নিয়মহীন কার্যের জন্য পুরোহিতগণ থিন্নার বিরোধিতা করেন এবং মেরে তাড়িয়ে দেন। এতে মহাদেব কষ্ট পেয়েছিলেন এবং শিবলিঙ্গের একটি চোখ থেকে অশ্রুর ন্যায় রক্ত ঝরছিলো, অতঃপর থিন্না পুরোহিতদের অনুপস্থিতে পুনরায় ফিরে এসে বিষয়টি লক্ষ্য করলেন এবং তিনি ওই চোখে ঔষধ লাগিয়ে দেন কিন্তু তারপরও তিনি লক্ষ করেন মহাদেবের চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছেই তখন ভগবান শিবের চোখ আহত হয়েছে এমন মনে করেন এবং থিন্না একটি তীর দিয়ে নিজের একটি চোখ বের করে

শিব লিঙ্গের রক্তক্ষরণের জায়গায় রেখে দেন। এতে লিঙ্গের ওই চোখের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়, তা দেখে থিন্না খুবই খুশি হয়। কিন্তু বিষয়টি আরও জটিল হয়ে যায়, তিনি লক্ষ্য করলেন যে লিঙ্গের অন্য চোখ থেকেও রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। তাই থিন্না ভাবলেন যে যদি তিনি তার অন্য চোখটিও ছিঁড়ে নেন তবে লিঙ্গের রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে এবং বলেন প্রভু আমার চোখ না থাকলেও আপনি আমার হাত ধরবেন কিন্তু প্রভু আপনাকে তো অনেক ভক্তকে দেখতে হবে, এই জগৎ পালন করতে হবে।এই বলে তিনি লিঙ্গের দ্বিতীয় চোখের উপর নিজের দ্বিতীয় চোখটি স্থাপন করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু অন্য চিন্তা উপস্থিত হলো, থিন্না অন্ধ হয়ে গেলে কোথায় দ্বিতীয় চোখটি বসাতে হবে সেটা তো বুঝতে পারবে না। তাই দ্বিতীয় চোখের রক্তক্ষরণের জায়গাটি চিহ্নিত করে তিনি লিঙ্গের উপর তাঁর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি রাখলেন এবং তার অন্য চোখটি বের করতে উদ্যত হলেন। তার চরম ভক্তি দেখে, ভগবান শিব থিন্নার সামনে হাজির হয়ে তাকে তার একমাত্র চোখ উপড়ে ফেলা থেকে বিরত করেন এবং তার দুটি চোখ পুনরায় তাকে ফিরিয়ে দেন। তিনি থিন্নাকে ৬৩ নয়নারদের মধ্যে দশম নয়নার হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং তখন থেকেই তাকে কান্নাপ্পান বা কান্নাপ্পা নয়নার নামে ডাকা হয়; কান্নাপ্পা অর্থ হচ্ছে চক্ষুদানকারী।কান্নাপ্পা ভগবান শিবের সাথে লিঙ্গে মিলিত হন এবং কান্নাপ্পা (কিছু মত অনুযায়ী যিনি তার অতীত জীবনে অর্জুন ছিলেন) শেষ পর্যন্ত মোক্ষ (মুক্তি) লাভ করেন।
[কান্নাপ্পা বিষয়ক কাহিনীটি বিস্তৃতভাবে (তামিল) শৈব দর্শনের অন্যতম পুরাণ পেরিয়া পুরাণ এর তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে, তাছাড়াও বিভিন্ন শৈব গাঁথা ও উপাখ্যানমূলক গ্রন্থে রয়েছে]

ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম নিয়ম কানুনে আবদ্ধ নয়। নিজের অবস্থান থেকে ভগবানের উপর আস্থা রাখুন এবং নিজের বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি সমর্পণ করুন।

“জয় মহাকাল”

পুরুষ প্রকৃতি, শিব লিঙ্গ ও জগতের উৎপত্তি

অভিক ঢালী

" সর্বসমুদ্ভব কারণ লিংগম্ "

অর্থ : সৃষ্টির উদ্ভবের কারণ হচ্ছে লিঙ্গম্ ।
(শ্রীমৎ আদিশঙ্করাচার্য বিরচিত লিঙ্গাষ্টাকাম)

এই শিব লিঙ্গম হচ্ছে নির্গুণ এবং সগুণ সদাশিবের বা পরমাত্মার প্রতীক। কিন্তু এমন কিছু লিঙ্গম আছে যেগুলো যেগুলো Genital Organ এর মতো আকৃতির। সেটা নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।

lingam - ১) সৃষ্টির বীজধারণকারী (Male Genital Organ)
yoni- ২) সৃষ্টির উৎস ও বীজপালনকারী (Female Genital Organ)

ভগবান শিব হচ্ছেন সমুদ্ররূপ এবং গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা উমা হচ্ছেন সেই সমুদ্রের কূল । ভগবান ত্রিশূলধারী হচ্ছেন বৃক্ষস্বরূপ এবং উনার প্রিয় হচ্ছে সেই বৃক্ষের লতা।
(লিঙ্গ মহাপুরাণ - উত্তরভাগ - অধ্যায় ১১ - শ্লোক ৬)
এখানে রূপক অর্থে সৃষ্টিতত্ত্ব, পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এই পুরুষ প্রকৃতির মিলনের ফলেই এই জগতের সৃষ্টি।
ধরুন একটা বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। এখানে বীজ হচ্ছে কারন (এছাড়াও আরো অনেক কারন রয়েছে যেমন সূর্যালোক,জল ইত্যাদি) আর অঙ্কুর হচ্ছে কার্য (effect)।এখন বীজ কিন্তু সবুজ নয় কিন্তু অঙ্কুরিত উদ্ভিদের সবুজ রং সহ সকল গুণ বীজের অভ্যন্তরে লুকায়িত থাকে।আমরা মানুষরা সবসময় কার্য বা প্রভাবকে বোঝার চেষ্টা করি এবং এর কারণকে খুঁজি।এই কারন কে জানতে পারি শুধু কার্যের পিছনে লুকায়িত সত্যকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে। সেই সাথে কারণ ঠিক তার নিজের অবস্থায় আছে। কারণ ছাড়া আমরা কার্য কে কল্পনাও করতে পারি না।
মনে করুন এই পৃথিবীতে কোনো গাছ নেই। কিন্তু আপনার কাছে কিছু বীজ সংগ্রহে আছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বীজ হতে বৃক্ষে রূপান্তর হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই বুঝবে না যে বীজই অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষে রুপান্তরিত হয় বা বীজ থেকে গাছ হবে। এই ভাবেই আমরা কার্য থেকে কারণকে বোঝার চেষ্টা করি। সর্বোপরি আমাদের আসে পাশের সকল

প্রকৃতি, পরিবেশ, মহাজগৎ সবই কার্যকারণের একটা জটিল রূপ । এখন লিঙ্গ হলো কার্য আর অলিঙ্গ হলো কারণ ।

আমাদের মুল আগ্রহ লিঙ্গ নিয়ে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ হলো বিকশিত কার্য (effect)।
লিঙ্গম্ঃ

কথং লিঙ্গোপ্তবং নাম ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।

কথঞ্চ প্রলয়ং বাপি লিঙ্গে গচ্ছতি নিত্যশঃ। ১৩ ।

অনুবাদ : এই সচরাচর ত্রৈলোক্য শিবলিঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া শিব- লিঙ্গ সর্ব্বতীর্থময়।। শিব মহাপুরাণ / সনৎকুমার সংহিতা / চতুর্দ্দশ অধ্যায় / শ্লোক ১৩।।

যোনিঃ

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥

অনুবাদ : হে ভারত ! প্রকৃতি সংজ্ঞক ব্রহ্ম আমার যোনিস্বরূপ এবং সেই ব্রহ্মে আমি গর্ভাধান করি, যার ফলে সমস্ত জীবের জন্ম হয়।
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১৪/৩)

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥

অনুবাদ : হে কৌন্তেয় ! সকল যোনিতে যে সমস্ত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপী যোনিই তাদের জননী-স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১৪/৪)
আশা করি সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের এই গভীর দর্শন একটু হলেও বোঝাতে পেরেছি। এইভাবে এই মহান সৃষ্টিকে শুধু মাত্র ঈশ্বরই সৃষ্টি করতে পারে। আর তার এই সৃষ্টির আদি উৎস ধরা হয় পুরুষ আর প্রকৃতি যা লিঙ্গ এবং যোনি স্বরূপ।
ইত্যুক্তশ্চ তদা ব্রহ্মা তান্ প্রোবাচ তদা স্বয়ম্।

আরাধ্য গিরিজা দেবীং প্রার্থয়ধ্বং শুভাৎ তদা ॥ ২৭।।

যোনিরূপং ভবেচ্চেদ্বৈ তদা এ স্থিরতাং ভজেং।

ভদা প্রসন্নাৎ তাৎ দৃষ্টা তদেবং কুরুতে পুনঃ ॥২৮।।

অনুবাদ : তাঁহারা এইরূপ কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, মঙ্গলদায়িনী গিরিজা দেবীর আরাধনা কর, তিনি যদি প্রসন্না হইয়া যোনিরূপ ধারণ করেন, তাহা হইলে এই লিঙ্গ স্থিরভাব অবলম্বন করিবে।
(শিব মহাপুরাণ / জ্ঞানসংহিতা / দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় / শ্লোক ২৭ ও ২৮)
**প্রথমেই বলা হয়েছে সব শিব লিঙ্গম Male Genital Organ আকৃতির নয় বিশেষ কিছু লিঙ্গম এরকম আকৃতির হয়। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন কেদারনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ, সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ বা অনান্য সয়ম্ভু লিঙ্গম্ গুলো একরকম আকৃতির লিঙ্গম আর এগুলো আরেকরকম ।আসলে

এগুলো একই পরমেশ্বরের প্রতীক এবং প্রত্যেক আকৃতির নিজস্ব মাহাত্ম্য।
আমাদের উদ্ভব বা জন্ম যেমন আমাদের মাতা পিতার ফলে হয়েছে তেমনি পুরো সংসারের সৃষ্টি বোঝাতে ঈশ্বরের এই লিঙ্গম এবং যোনি আকৃতিকে দেখানো হয়েছে। জগদাদির্জগদযোনির্জগদস্ত গতোহপি চ।
পালয়ন সর্ব্বলোকাংশ শাস্তো তব সদাশুভ ॥ ৩৬।।
অনুবাদ : তুমি জগতের আদি, তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি জগতের অন্তর্গত হইয়াও সকল লোককে পালন করিতেছ, হে শুভ!
(শিব মহাপুরাণ / জ্ঞানসংহিতা / দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় / শ্লোক ৩৬)

ভুল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন....

হর হর মহাদেব

শিবাজী ও আওরঙ্গজেব সমাচার

মৃগাঙ্ক রায়

শিবাজীর নাম শুনে নি এমন হিন্দু হয়তো পাওয়া যাবে না বর্তমানে, তবে সমস্যার বিষয় হচ্ছে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে নিয়ে ঐতিহাসিক বিচারে কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ইদানিং বিষয়টা ধীরে ধীরে বাড়ছে। লেখাটি এইরকমই একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ নিয়ে —

ওইদিন চোখে পড়লো যদুনাথ সরকারের আওরঙ্গজেবকে নিয়ে লিখিত বইকে ভিত্তি করে কিছু লোক আওরঙ্গজেবের প্রশংসা করছে এবং সেটা খুব ফলাও করে প্রচার হচ্ছে; তা ভালো, প্রচার প্রসার হওয়াটাই উচিত। কিন্তু, উনারই(যদুনাথ সরকার) 'শিবাজী' নামক একটি বাংলা বইয়ে আবার আওরঙ্গজেবকে শাসক হিসেবে নিন্দা করা হচ্ছে। এক কথায় সুশাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি, বরং বলা হচ্ছে আওরঙ্গজেব শিবাজীর নিকট নিরুপায় ছিলো, কোনো ভাবেই আওরঙ্গজেব শিবাজীকে আটকাতে পারছে না। তারপর যদুনাথ সরকারের ইংরেজিতে অনুবাদিত 'মসির ই আলমগিরি' গ্রন্থেই আওরঙ্গজেবের মূর্তি ভাংচুরের মতো অনেক অত্যাচারের বিষয়ে রয়েছে।
যদুনাথ সরকারের 'শিবাজী' নামক বইয়ের একটি অংশে রয়েছে, পারস্যের রাজা দ্বিতীয় শাহ আব্বাস আওরংজীবকে ধিক্কার দিয়া পত্র লিখিলেন (১৬৬৭) - "তুমি নিজকে রাজার রাজা (শাহানশাহ বাদশাহ) বল আর শিবাজীর মত একটা জমিদারকে দুরস্ত করিতে পারিলে না! আমি সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে যাইতেছি। তোমাকে রাজ্য-শাসন শিখাইব।" দেখুন এখানেও আওরঙ্গজেবের নিন্দাই করা হচ্ছে। তাছাড়া এই গ্রন্থে উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু অযৌক্তিক বিষয় দেখা গিয়েছে। যেমন - কিছু জায়গায় বলা হচ্ছে শিবাজী অমানবিক আবার শেষের উপসংহারে বলা হচ্ছে শিবাজীর মতো মানবিক রাজা কেউ হতে পারে না, কোথাও লেখক দেখাচ্ছেন শিবাজী টিকে ছিলেন বা রাজ্য বিস্তার করেছিলেন উনার সভাসদের বুদ্ধিতে আবার শেষের দিকে উপসংহারে বলছেন সভাসদদের কারণেই নাকি শিবাজী অনেক ক্ষেত্রে বিফল হয়েছেন ইত্যাদি।

আমার মতে এসবের মূল কারণ হচ্ছে - আমাদের দেশীয় ইতিহাসবিদের অভাব। সরকার মহাশয় অবশ্য উনার গ্রন্থে একটা বিষয় স্বীকার করেছেন, 'ইতিহাসে স্থান পেয়েছে' এমন একটি লাইন এবং সেগুলোর অধিকাংশ তথ্যসূত্র হিসেবে দেখিয়েছেন শিবাজীর শত্রুপক্ষ বা বহিরাগত শক্তিদের লেখা গ্রন্থ থেকে। তাই এখানে একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে - কোন যুক্তিতে একজন নিজের শত্রুর প্রশংসা করবে বা অন্যকে মহান বানাতে চাইবে? সেরকম বহিরাগত শক্তি বা ব্যক্তিও ইতিহাসে পাওয়া যায় যারা শত্রুর প্রশংসা করেছেন তবে সংখ্যায় খুবই কম!

যাই হোক যারা একভাবে বা সর্ব সাধারণের মতো চিন্তা করেন তারা উল্লেখিত যুক্তির বিরুদ্ধেই যাবেন এটা নিশ্চিত কিন্তু তাতে যুক্তির খণ্ডন হবে না এটাও নিশ্চিত....
আমাদের অধিকাংশ ইতিহাস যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেটা না বললেও হয়তো চলবে। তাও শুধু একটাই কথা বলবো প্রত্নতত্ত্বভিত্তিক যে ইতিহাস সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা উচিত, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে ও যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন ইতিহাস বইয়ের সহায়তায় ইতিহাস চর্চা করা উচিত অন্যথা সবই ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে যেমনটা আমাদের বেদ ভাষ্যকার আচার্য্য সায়ণ এর ঋগ্বেদ ভাষ্যে থাকা আলোর বেগের ধারণা, ঋষি কণাদের বৈশেষিক দর্শনে উল্লেখিত পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র (যা নিউটনের সূত্রের সঙ্গে মিলে যায় কিন্তু নিউটনের পূর্বেই আমাদের দর্শন শাস্ত্রে সূত্রগুলো বিদ্যমান ছিলো) যা আজ আমাদের গুরুত্বহীনতার জন্য অধিকাংশ লোকজন জানেই না (যদিও আলোর বেগ বা পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র বিষয়ক তথ্য পুরোপুরি ইতিহাস নয় তাও বুঝানোর সুবিধার্থে উপমা দেওয়া হয়েছে)।

স্যার যদুনাথ সরকারের মতো মানুষকে নিন্দা করার দুঃসাহস আমার নেই, আমি উনাদের যথেষ্ট সম্মান করি কারণ উনারা না থাকলে যতটুক ইতিহাস বেঁচেছে তাও হয়তো থাকতো না। তবে গবেষণার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা দরকার, একাধিক ইতিহাসবিদদের গ্রন্থ পড়া দরকার এবং সবার মতো এক পথে না চলে ভিন্ন পথে যৌক্তিকভাবে সমাধান খোঁজার চেষ্টাও করা উচিত।

জয় ভবানী
জয় শিবাজী
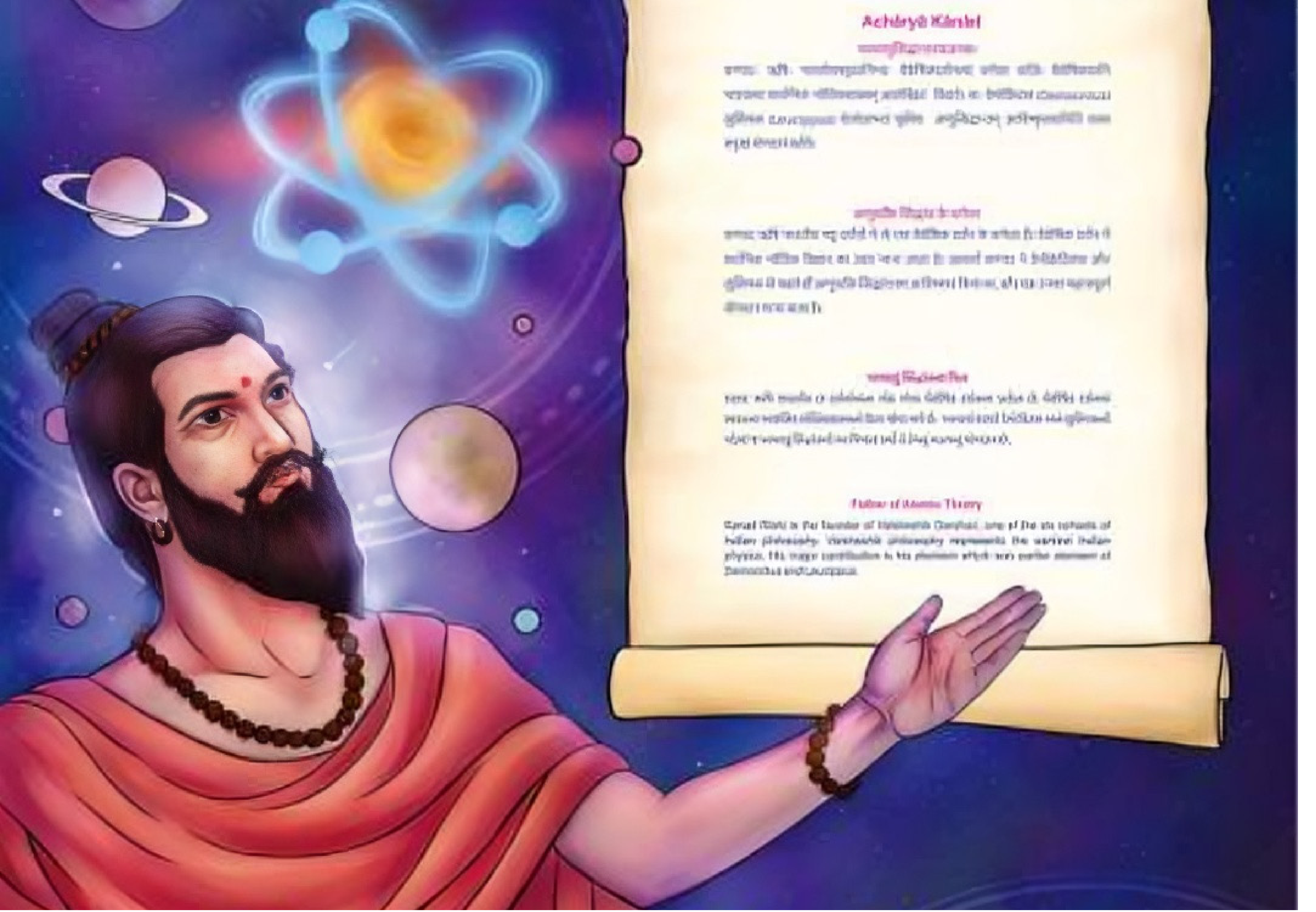
মহর্ষি কণাদ ও বৈশেষিক দর্শন

অর্ক বিশ্বাস

প্রাচীন ভারতবর্ষের একজন অন্যতম ঋষি ছিলেন মহর্ষি কণাদ। সনাতন ধর্মের ছয়টি মূল দর্শনের একটি বৈশেষিক দর্শনের সূত্রপাত এই ঋষিবরের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। কণাদের অপর নাম ছিল উলুক। কিছু পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী তণ্ডুলকণা খেয়ে জীবনধারণ করতেন বলেই ইনি 'কণাদ' নামে পরিচিত হন। প্রাচীন ভারতবর্ষের দার্শনিক অগ্রযাত্রায় মহর্ষি কণাদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। অতি দুঃখের একটি বিষয় হলো সনাতনী সমাজের একটি বৃহৎ অংশ বর্তমানে মহর্ষি কণাদের উদ্ভাবনী কীর্তির বিষয়ে অজ্ঞ। আধুনিক বিজ্ঞানীদের যে কিছু মৌলিক তত্ত্বের উপর আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার এত অগ্রগতি, এই সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভাবন বহু পূর্বেই প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞানীগুণী মুনিঋষিরা করে গিয়েছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে মহর্ষি কণাদের একটি বড় অবদান রয়েছে। কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথাযথভাবে জানলে পাঠকগণ ধারাবাহিকভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন বলে মনে করি।

বৈশেষিক দর্শনের মাধ্যমে ঋষি কণাদ আমাদেরকে জগৎ-তত্ত্ব বিচারে প্রেরণা প্রদান করেন। বৈশেষিক দর্শন ১০ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করে আহ্নিক আছে এবং সর্বমোট ৩৭০ টি সূত্র নিয়ে সম্যক দর্শন গঠিত। বৈশেষিক দর্শন প্রধানত সপ্ত পদার্থ ভিত্তিক, যা বিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে:

১. দ্রব্য – জড় ও চেতনাসম্পন্ন বস্তু
২. গুণ – রূপ, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি
৩. কর্ম – গতি বা বল
৪. সামান্য– সাধারণ বৈশিষ্ট্য
৫. বিশেষ – পৃথক সত্তার বৈশিষ্ট্য
৬. সমবায়– এক বস্তুতে অন্যটির অস্তিত্ব
৭. অভাব – অনুপস্থিতি বা শূন্যতা

এই প্রবন্ধে বৈশেষিক দর্শন হতে ঋষি কণাদের কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমন্বিত কীর্তি উল্লেখ করার চেষ্টা করছি যা পাঠকদের সনাতন ধর্মের মুনি-ঋষিদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করাতে কিছুটা ভূমিকা রাখবে।

বর্তমানে আধুনিক সময়ে আমরা সকলেই পরমাণুর বিষয়ে অবগত রয়েছি। প্রত্যেকটি পদার্থই পরমাণু দিয়ে গঠিত এবং বিভিন্নরকম পরমাণু মিলিত হয়েই বিভিন্নরকম পদার্থের উদ্ভব হয়। এই সমস্ত বিষয় আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে জানি এবং এই সমস্ত জ্ঞানলাভ করার কারণে আমরা প্রতিনিয়তই আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ দিই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সহস্র বছর পূর্বে এই ভারতভূমিতেই পরমাণু নিয়ে চর্চা হয়েছিল এবং বহু মুনিঋষিই বলে গিয়েছেন যে সকল পদার্থই অন্তিমে এক প্রকার পরম অণু দিয়ে গঠিত। মহর্ষি কণাদ তাঁদের মধ্যেই একজন। মহর্ষি কণাদ তাঁর দর্শনগ্রন্থে এটাই বুঝিয়েছেন যে জাগতিক প্রত্যেকটি বস্তুই সেই বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্র অপর একটি বস্তু দ্বারা গঠিত এবং এভাবে যেকোনো বস্তুকে বিভাগ করতে করতে অবশেষে যেই ক্ষুদ্রতম অবয়বে উপস্থিত হওয়া যায়, তাইই হলো সেই পরমাণু। এই পরমাণু আবার বিভিন্ন রকমের যেমন: পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু ইত্যাদি। এই পরমাণুই হলো সেই 'বিশেষ' পদার্থ যার থেকে 'বৈশেষিক দর্শন' নামটি এসেছে। বৈশেষিক মতে, পরম অণু নামক বিশেষ পদার্থটি হচ্ছে সৎ পদার্থ অর্থাৎ নিত্য বস্তু। পরমাণুর কোনো কারণ নেই, অর্থাৎ পরমাণু সর্বদাই বিদ্যমান এবং কারো দ্বারা সৃষ্ট নয়। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পরমাণুর সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস ঘটে।

সদকারণবন্নিত্যম্॥

সরলার্থ:- সৎপদার্থের মধ্যে যাহার কারণ নাই, তাহাকে নিত্য বা সৎপদার্থ বলে।
(বৈশেষিক সূত্র-৪/১/১)

এই সূত্রে পরমাণুকেই কণাদ সেই নিত্য বা সৎপদার্থ হিসেবে ইঙ্গিত করেছেন। বৈশেষিক দর্শনের উপর প্রচলিত বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকার উপর ভিত্তি করে উক্ত সূত্রের ব্যাখায় আচার্য শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন বলেছেন-
"পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের যাহা পরম অণু—অবিভাজ্য অংশ—তাহা নিত্য; তদপেক্ষা বড় হইলেই অনিত্য।"
এই প্রসঙ্গে বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের ভাষ্যতাৎপর্যে শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার উল্লেখ করেছেন-
"পরমাণুরূপ পৃথিবী নিত্য ও কার্য অর্থাৎ পরমাণুভিন্ন দ্ব্যণুকাদিরূপ সকল পৃথিবীই অনিত্য। দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া একটা দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয় আবার তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া একটি ত্রসরেণু বা ত্রুটি উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে মহাপৃথিবী, মহত্তর পৃথিবী ও মহত্তম পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহার বিস্তৃত বিবরণ সৃষ্টিসংহারপ্রকরণে পাওয়া যাইবে। পরমাণু ও দ্ব্যণুকরূপ পৃথিবী প্রত্যক্ষ নহে, ত্রসরেণু হইতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।"
অর্থাৎ পরমাণু পরিমাণ পৃথিবী নিত্য এবং বিভিন্ন পরমাণুর একত্রে মিলিত দ্ব্যণুক থেকে শুরু করে সম্মিলিত জগৎ অনিত্য। এখানে পরমাণুরূপ পৃথিবী বলতে পরমাণু পরিমাণ পৃথিবীর অংশ অর্থাৎ পরমাণুকেই বোঝাচ্ছে এবং এই পরমাণু নিত্য অর্থাৎ এর কোনো ধ্বংস নেই, এটি স্থায়ী বস্তু। দুইটি পরমাণু মিলিত হয়ে একটি দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয় এবং এরকম তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হয়ে একটি ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। পরমাণু ও দ্ব্যণুক খালি চোখে প্রত্যক্ষ করা যায় না কিন্তু ত্রসরেণু থেকে পরবর্তী সকল যৌগিক পদার্থই সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায়। আর এভাবেই অণু-পরমাণুগুলো মিলিত হতে হতে ক্রমে জগতের উৎপত্তি হয়। নিত্য পদার্থ পরমাণু থেকে উৎপন্ন হয়েও দ্ব্যণুক থেকে শুরু করে সমগ্র জগৎ অনিত্য অর্থাৎ অস্থায়ী। কেননা তা সময়ের সাথে সংযোজিত-বিয়োজিত হয়ে নিজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং সমস্ত যৌগিক বস্তু প্রলয়ের সময় পুনরায় বিচ্ছিন্ন পরমাণুসমূহে পরিণত হয়। বৈশেষিক মতে, বিচ্ছিন্ন স্বাধীন পরমাণুর সংযোজন-বিয়োজন সম্ভব নয়। তাই পরমাণু নিত্য।

তস্য কার্য্যং লিঙ্গম্॥

সরলার্থ:- কার্য তাহার অনুমাপক॥
(বৈশেষিক সূত্র-৪/১/২)

কার্য দ্বারাই কারণের অনুমান করা যায়। ইংরেজিতে বললে, Every effect has a cause behind it. প্রতিটা যৌগিক

বস্তকে পর্যবেক্ষণ করলে সেই যৌগিক বস্তর কারণ হিসেবে অপেক্ষাকৃত মৌলিক বস্তর ধারণা পাওয়া যায়। তেমনি এই বিশ্বজগতের বিভিন্ন যৌগিক বস্তু পর্যবেক্ষণ করলে এর কারণ হিসেবে অপেক্ষাকৃত মৌলিক বস্তর সন্ধান পাওয়া যায় এবং এভাবে মৌলিকতর বস্তু হতে আরো মৌলিকতর বস্তর সন্ধান করতে করতে অবশেষে এক বিশেষ বস্তু পরমাণুর অনুমান করা যায় যার আর বিভাজন হয় না। উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন উল্লেখ করেছেন-
"এই নিত্য সৎ পদার্থ দৃশ্য নহে, কার্য দ্বারা তাহার অনুমান করিতে হয়। এই যে বৃহৎ পৃথিবী ইহা বৃহৎ অবয়বসমূহ হইতে উৎপন্ন, সেই বৃহৎ অবয়ব স্থূল মৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন; সেই মৃৎপিণ্ড পবনবেগে সতত পরিচালিত পরমাণুর ক্রমসম্মিলনে উৎপন্ন; এই সম্মিলনকর্তাই ঈশ্বর। আমাদের সম্মুখে উর্ধ্বে- পার্শ্বে নিরন্তর পরমাণু-সমূহ বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিতেছে। কিন্তু কৈ, তাহারা মিলিয়া আমাদের দৃষ্টিরোধ করিতেছে না বা বৃহৎ মৃৎপিণ্ড হইয়া আমাদের মস্তকে নিপতিত হইতেছে না। ঈশ্বরের পরমাণু-সম্মিলন বিষয়ক প্রযত্ন ফলোন্মুখ হইলে তবে তাহারা মিলিত হইয়া বৃহৎ হয়, নতুবা হয় না। সুতরাং এই বৃহৎ পৃথিবী রূপ কার্য দ্বারা আমরা নিত্য পরমাণুর ও ঈশ্বরের অনুমান করিতেছি।"
অর্থাৎ নিত্যবস্তু পরমাণুকে সরাসরি দেখা যায় না। তবে এইযে আমাদের চারদিকে বৃহৎ বৃহৎ বস্তু এবং সর্বোপরি সমগ্র জগৎ এগুলো সবই নিজ অবয়বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট অপর বস্তর সম্মিলনে গঠিত। বৃহৎ ভূমিসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃৎখণ্ড সমূহের সম্মিলনে গঠিত, আবার ক্ষুদ্র মৃৎখণ্ডগুলোও তার তুলনায় ক্ষুদ্রতর মৃৎখণ্ডের সম্মিলনে গঠিত। এভাবেই ক্ষুদ্রতর হতে ক্ষুদ্রতর সকল বস্তুই যে কোনো এক ক্ষুদ্রতম অবয়ব পরম অণুর সম্মিলন দ্বারা গঠিত তার অনুমান হয়। কিন্তু এই বিভিন্ন পরম অণুগুলোর সম্মিলন ঘটে, এই সম্মিলন ঘটার পিছে কোনো এক শক্তি তো নিশ্চয়ই কাজ করে, কারণ পরমাণু অচেতন বস্তু। তাহলে সেই চেতন শক্তিটা কী? এই শক্তিই হলো ঈশ্বর। ঈশ্বরের শক্তিতেই পরমাণুগুলো একে অপরের সাথে যথাযথভাবে সম্মিলিত হয়ে সুব্যবস্থাসম্পন্ন জগতের রচনা করে।
নিত্যং পরিমণ্ডলম্॥

সরলার্থ:- পরমাণু পরিমাণকে পরিমণ্ডল কহে, উহা নিত্য॥
(বৈশেষিক সূত্র-৭/১/২০)
অর্থাৎ পরমাণুর আকার পরিমণ্ডলাকার বা গোলকাকার॥
এছাড়াও বৈশেষিক দর্শনের আরো বহু সূত্রে পরমাণুবিষয়ক তথ্য পাওয়া যায়।
আমরা প্রায় প্রত্যেকেই জানি, নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন যে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবীতে যেকোনো বস্তু সবসময় নিচের দিকে পতিত হয়। কিন্তু এই বিষয়টিও নিউটনের বহু পূর্বে কণাদ মুনি উল্লেখ করে গিয়েছিলেন।
সংযোগাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্॥

সরলার্থ:- সংযোগ অর্থাৎ পতনের প্রতিবন্ধক না থাকিলেই গুরুত্ব হেতু পতন হইয়া থাকে॥
(বৈশেষিক সূত্র-৫/১/৭)
এটি বোঝার জন্য একটি উদাহরণ ধরা যাক। গাছের সঙ্গে ফলের যতদিন সংযোগ থাকে, গুরুত্ব থাকলেও ততদিন তা নিচে পতিত হয় না, কিন্তু সেই সংযোগ না থাকলেই তা সঙ্গে সঙ্গে নিচে পতিত হয় গুরুত্বের কারণে। অর্থাৎ উর্ধ্বমুখী বল না থাকলে বস্তু সর্বদাই গুরুত্বের ফলে নিচে পতিত হবে। যাকে আমরা আধুনিককালে মহাকর্ষ বা অভিকর্ষ বলি সেটাকেই বহু পূর্বে কণাদমুনি 'গুরুত্ব' হিসেবে ব্যাখা করে গিয়েছেন।
নিউটনের যে তিনটি গতিসূত্র প্রচলিত রয়েছে, মহর্ষি কণাদ তার নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো বহু পূর্বেই উল্লেখ করে গিয়েছেন-

কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ॥

সরলার্থ:- কারণ না থাকিলে কার্য হয় না॥
(বৈশেষিক সূত্র-১/২/১)

নোদনবিশেষাভাবাণ্নোর্দ্ধং ন তির্য্যগগমনম্॥

সরলার্থ:- নোদনবিশেষের অভাবে উর্ধ্বগমন বা তির্যকগমন হয় না॥
(বৈশেষিক সূত্র-৫/১/৮)
কারণ ছাড়া কখনোই কোনো কার্য ঘটানো সম্ভব না। নোদন দ্বারা সেই কার্যকর শক্তিকে বোঝায় যা কোনো বস্তর গতি পরিবর্তন করে। অর্থাৎ কার্যকরী শক্তির প্রয়োগ বা বলপ্রয়োগ না করলে কোনো বস্তর উপরে বা নিচে কোনো প্রকার গতি সম্ভব হয় না। নিউটনের প্রথম সূত্রের সাথে এই ধারণা অনেকটাই মিলে যায়। নিউটন বলেছিলেন, বাহ্যিক বলের অভাবে স্থির বস্তু স্থিরই থাকে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল গতিশীল থাকে।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র মূলত বল ও গতির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে। কোনো বস্তুর গতির পরিবর্তন সেই বস্তুতে প্রয়োগ করা বলের উপর নির্ভরশীল। এরকম একই ধারণা বৈশেষিক দর্শনেও পাওয়া যায়। মহর্ষি কণাদ শরনিক্ষেপের উদাহরণ দিয়ে বল ও গতির সম্পর্ক প্রতিপাদন করে দেখিয়েছেন।
নোদনাদাদ্যমিষোঃ কর্ম্ম তৎকর্ম্মকারিতাচ্চ সংস্কারাদুত্তরং তথোত্তরঞ্চ॥
সরলার্থ:- শরের প্রথম কর্ম নোদননামক সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়; ঐ প্রথম কর্মের জন্য বেগনামক সংস্কারে পরবর্তী কর্ম উৎপন্ন হয়; এইরূপ উত্তরোত্তর জানিবে॥
(বৈশেষিক সূত্র-৫/১/১৭)
অর্থাৎ শরনিক্ষেপের সময় বাহ্যিক বলের প্রভাবে বেগ উৎপন্ন হয় এবং এর মাধ্যমেই শরের মধ্যে গতির সৃষ্টি হয়, আর বেগের মাধ্যমেই শর পরবর্তীতে গতিশীল হতে থাকে। এখানে কর্ম বলতে গতিশীল অবস্থাকেই বুঝতে হবে।
নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি হচ্ছে- প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। গাণিতিকভাবে দেখলে, প্রতিটি বল প্রয়োগের সাথে সাথে বিপরীত দিকে অপর একটি বল এসে পূর্বের বলকে প্রশমিত করে। ঋষি কণাদ যেভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন তা হলো:-

কার্য্যবিরোধি কর্ম্ম॥

সরলার্থ:- কর্ম, কর্ম দ্বারা বিনষ্ট হয়।
(বৈশেষিক দর্শন-১/১/১৪)
অর্থাৎ একটি কর্ম বা ক্রিয়া তার প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ অপর একটি কর্ম দ্বারাই বিনষ্ট বা প্রশমিত হয়।
পৃথিবীর আকস্মিক ক্রিয়া বা ভূমিকম্পের কারণও বৈশেষিক দর্শনে পাওয়া যায়।

নোদনাভিঘাতাৎ সংযুক্তসংযোগাচ্চ পৃথিব্যাং কর্ম্ম॥

সরলার্থ:- নোদন (বল), অভিঘাত (বৃহৎ সংঘর্ষ) এবং সংযুক্ত-সংযোগ (ভূ-গর্ভস্থ বিভিন্ন স্তরের একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত-সংযোগের ঘটনা) পৃথিবীতে কর্ম (এই প্রসঙ্গে কর্ম অর্থে স্পন্দনক্রিয়া) হইবার কারণ॥
(বৈশেষিক সূত্র-৫/২/১)

বৃষ্টিপাতের কারণ সূর্য কর্তৃক যে জলের বাষ্পীয়করণ প্রক্রিয়া সে সম্পর্কেও মহর্ষি কণাদ উল্লেখ করেছেন:-

নাড্যো বায়ুসংযোগাদারোহণম্॥

সরলার্থ:- সূর্যরশ্মিসমূহ বায়ু-সংযোগ সাহায্যে সেই জলকে উর্ধ্বে আরোহণ করাইয়া থাকে॥
(বৈশেষিক সূত্র-৫/২/৫)
জলের বরফে পরিণত হওয়া এবং পুনরায় বরফ হতে জলে পরিণত হওয়ার সাথে তাপের প্রভাবের বিষয়টিও মহর্ষি কণাদ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

অপাং সংঘাতো বিলয়নঞ্চ তেজঃসংযোগাৎ॥

সরলার্থ:- জলের সংঘাত অর্থাৎ জমাট এবং বিলয়ন (গলে যাওয়া) অর্থাৎ দ্রবীভাব তেজ (তাপ) সংযোগমূলক॥
(বৈশেষিক সূত্র-৫/২/৮)
মেঘগর্জনের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে-
তত্র বিস্ফূর্জথুর্লিঙ্গম্॥

সরলার্থ:- বজ্রনির্ঘোষ সেই তেজঃসংযোগের অনুমাপক॥
(বৈশেষিক সূত্র-৫/২/৯)
উক্ত সূত্রের ব্যাখায় আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন বিস্তারিত বলেছেন- "যেরূপ তাপ হইলে, জল সংঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কঠিনাকৃতি হয় এবং যেরুপ তাপ হইলে, জল সংঘাতবস্থা বা বাষ্প হইতে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, সেই বিভিন্নপ্রকারে তাপযুক্ত শীত ও উষ্ণ বস্তুদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সন্নিহিত মেঘে বা বায়ুতে যে তড়িৎ উৎপন্ন করে, তাহা ঐ শীতোষ্ণ বস্তুদ্বয়ের তড়িদ্ভাগের সহিত সম্মিলন হইবার পথে জলাদি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইলেই বজ্রনির্ঘোষ (মেঘগর্জন) হয়। সুতরাং বজ্রধ্বনি যে বিভিন্নরূপ তাপসংযোগের অনুমাপক ইহা বেশ বুঝা গেল।"
এপর্যন্ত পড়ার পর পাঠকগণ নিশ্চয়ই মহর্ষি কণাদের সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টি সম্পর্কে কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছেন। উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও আরো বহু গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমন্বিত বিষয় বৈশেষিক দর্শনে উপলব্ধ রয়েছে এবং ঋষি কণাদের মতোই অসংখ্য মুনি-ঋষিদের প্রণীত জ্ঞানেই সনাতন ধর্ম সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ। তাই আসুন, আমরা আমাদের সেই প্রাচীন পরম্পরা ও সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারকে পুনরায় নতুন করে উজ্জীবিত করি। প্রবন্ধটি ভগবতীর চরণে সমর্পণ করে এখানেই সমাপ্ত করছি। পাঠকগণ ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ধন্যবাদ।

সনাতন ধর্ম ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

শ্রীঅপূর্ব মোদক চৌধুরী

সনাতন ধর্মে ঋগ্বেদিক যুগ থেকেই এই জগতকে জানার আগ্রহ বা কৌতুহল আর্যজাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যেটার জলজ্যান্ত প্রমাণ ঋগ্বেদের শাকল শাখার দশম মন্ডলের ১২৯নং সূক্ত যার নাম নাসদীয় সূক্ত। উক্ত সূক্তের একটি শ্রুতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই সেটা হলোঃ-
“সেই সময় বা প্রলয়ের অবস্থায় কোন অসৎ ছিল না (শৃগালের শিংয়ের মতো যা অস্তিত্বহীন)। যা সৎ (আত্মা ইত্যাদি) তাহাও ছিল না। কোন পৃথিবী ছিল না এবং আকাশ তথা আকাশে সপ্তভুবনও ছিল না।
আবরণ (মহাবিশ্ব) কোথায় ছিল? কার স্থান কোথায় ছিল? সেই সময় কি দুর্গম এবং গম্ভীর জল ছিল?”
(ঋগ্বেদ শাকল শাখা ১০/১২৯/১)
এর থেকেই বোঝা যায় ঋগ্বেদিক যুগে আর্যজাতির মধ্যে এই জগৎকে জানার আগ্রহ ও কৌতূহল সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বিষ্ণুভাগবতের একাদশ স্কন্দেও উল্লেখ আছে,
“হে উদ্ভব ! এই জগতে যাঁরা আছেন তাদের কাছে জগৎ কি? এতে আছেই বা কি? এই সব বিচারে সুনিপুণ তাঁরা বিবেকশক্তির সাহায্যে চিত্তের সকল অশুভ বাসনাসকল থেকে প্রায়শ রক্ষা পেয়ে থাকে।” (বিষ্ণুভাগবত ১১/৭/১৯)

হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হলো যে হিন্দু ধর্ম আজ নয় বরং প্রাচীন কাল থেকেই এই জগৎকে খুব গভীরে জানার চেষ্টা করেছে। কেউ দার্শনিক ভাবে অবার কেউ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এই জগতে কি আছে কি নেই এই বিষয়ে গভীর চিন্তা প্রকাশ করেছেন। হিন্দু ধর্ম কাউকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে বা স্বতন্ত্র দার্শনিক দৃষ্টিকোণ রাখতে নিষিদ্ধ করেনি। প্রাচীন ভারতে যারাই এই ধরনের চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন তাদের কখনো মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় বিজ্ঞানী ও স্বতন্ত্র দার্শনিকদের ন্যায় মৃত্যু বরণের মতো করুণ পরিণতি হয় নি। কিন্ত হিন্দুরা কি ধরনের চিন্তা ধারা রাখত জ্ঞানার্জনের জন্য? প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে কি সত্যিই কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন ছিল? কেন প্রাচীনকালে ভারতীয় গণিতবিদ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পন্নদের অবস্থা মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মতো হয়নি? এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।
আমাদের ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকেই আর্য্যজাতিরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন। শুধু রাখতেনই না বরং সকলকে

রাখার জন্য উদ্বুদ্ধও করতেন। এই বিষয়ে জানতে ও বুঝতে হলে প্রথমে প্রয়োজন আমাদের হিন্দু ধর্মে প্রচলিত প্রমাণ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা।

প্রমাণ হলো যাহার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা জন্মে। যোগদর্শনের সমাধিপাদের ৭ নং সূত্রের মতে প্রমাণ তিনটি যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ন্যায় দর্শন মতে প্রমাণ ৪ প্রকার যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এছাড়াও বেদান্ত মতে প্রমাণ ছয়টি ও সাংখ্যকারিকার মতে প্রমাণ তিনটি। এদের মধ্যে আমাদের বিশেষ ভাবে জানতে হবে দুটি প্রমাণ সম্পর্কে এক প্রত্যক্ষ এবং দুই অনুমান।

হিন্দু ধর্মে ছয়টি দর্শন রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো ন্যায় দর্শন। ন্যায় শব্দের অর্থ "নীয়তে অনেন ইতি ন্যায়ঃ" । আবার এও বলা যায় "প্রমাণৈ অর্থপরীক্ষণম্" (বাচস্পতি) অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা বস্তুর পরীক্ষা। সত্য নির্ধারণে বুদ্ধি যাহা দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা যুক্তি। যুক্তি চিন্তার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে কথিত। এই যুক্তিই ন্যায়। তাই ন্যায় দর্শনের আলোকে পূর্বে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করবো।

প্রত্যক্ষ সম্পর্কে ঋষি গৌতম কর্তৃক ন্যায় দর্শনে বলা যায়,

"ইন্দ্রিয়ার্থ- সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞান মব্যপদেশ্যমব্যভচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং ।। ন্যায় দর্শন ১|১|৪"

উক্ত সূত্রের ইন্দ্রিয় শব্দের দ্বারা বুঝতে হবে ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক, শ্রোত্র এবং মন এই ষড়েন্দ্রিয়কে। অর্থ শব্দ দ্বারা বুঝতে হবে সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার গ্রাহক ইন্দ্রিয় বিশেষের যে সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ বিশেষ তাহাই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ।

সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের জন্য যে অব্যভিচারি জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় তারই নাম প্রত্যক্ষ প্রমা। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গন ও তাহাদের বিষয় পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হলে যে জ্ঞান জন্মে তাহার যে অংশ অব্যপদেশ্য পূর্বে অবগত শব্দ জ্ঞানোৎপন্ন নহে, তাহা যদি অব্যভিচারি ও ব্যবসায়াত্মক (নিশ্চিত) হয় তবে তাকে প্রত্যক্ষ বলে।প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়েরই ক্রিয়া রয়েছে।

অনুমান সম্পর্কে ঋষি গৌতম কর্তৃক ন্যায় দর্শনে বলা যায়,

তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধং অনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টং।। ন্যায় দর্শন ১|১|৫

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পূর্বক যথার্থ জ্ঞানই অনুমান প্রমাণ। পূর্ব প্রত্যক্ষ না থাকলে অনুমান হয় না। এককথায় কোন প্রত্যক্ষ দর্শনের সাহায্যে যুক্তি দ্বারা যে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের স্বরূপের জ্ঞান হয় সেটাই হলো অনুমান প্রমাণ। যেমন ধোঁয়া দেখলে অগ্নির বিদ্যমানের জ্ঞান হয়। কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে অনুমান প্রমাণ কখনো প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরোধী হবে না (ন্যায় দর্শন ১/১০/৫)।

হিন্দু ধর্মে জ্ঞান অর্জনে এই প্রত্যক্ষ অনুভব অর্থাৎ নিজের চারপাশের ঘটনা গুলোকে নিজের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে বুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ ও অনুমানকে অর্থাৎ সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নতুন জ্ঞান (hypothesis) লাভকে গুরুত্ব দিয়ে বিষ্ণুভাগবতে উল্লেখ আছে,

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে।।
(বিষ্ণুভাগবত ১১/৭/২০)

অনুবাদঃ প্রাণীসকলের মধ্যে বিশেষত মানব আত্মাই নিজ হিতাহিত বুঝতে সক্ষম, তাই সে নিজেই নিজের গুরু; কারণ সে নিজের প্রত্যক্ষ অনুভব ও অনুমান দ্বারা নিজ হিতাহিত নির্ধারণে পূর্ণরূপে সক্ষম।

উক্ত শ্লোকে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উদ্ধবকে উপদেশ দিচ্ছেন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আত্মা (চেতনশীল জীব) নিজেই নিজের গুরু হন।

এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লাভ করাকে বলা হয় অভিজ্ঞতাবাদ বা Empiricism। বর্তমানের আধুনিক বিজ্ঞান এই অভিজ্ঞতাবাদকে (Empiricism) ব্যবহার করে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখা করার চেষ্টা করে।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মানুষের অভিজ্ঞতাকে অধ্যয়ন করে যাওয়া বা সেখান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

কার্ল পিয়ার্সনের ভাষায়,

"বিজ্ঞানের কাজ হলো জাগতিক ঘটনাগুলির শ্রেণি বিভাগ , তাদের স্বকীয় ও পারস্পরিক ব্যবহারের স্বরূপ উন্মোচন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো পারস্পরিক ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই ঘটনাগুলি থেকে সত্যে পৌঁছবার প্রবণতা।" (Grammar of Science,1900, p.6)

বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী জে আর্থার টমসনের ভাষায়,
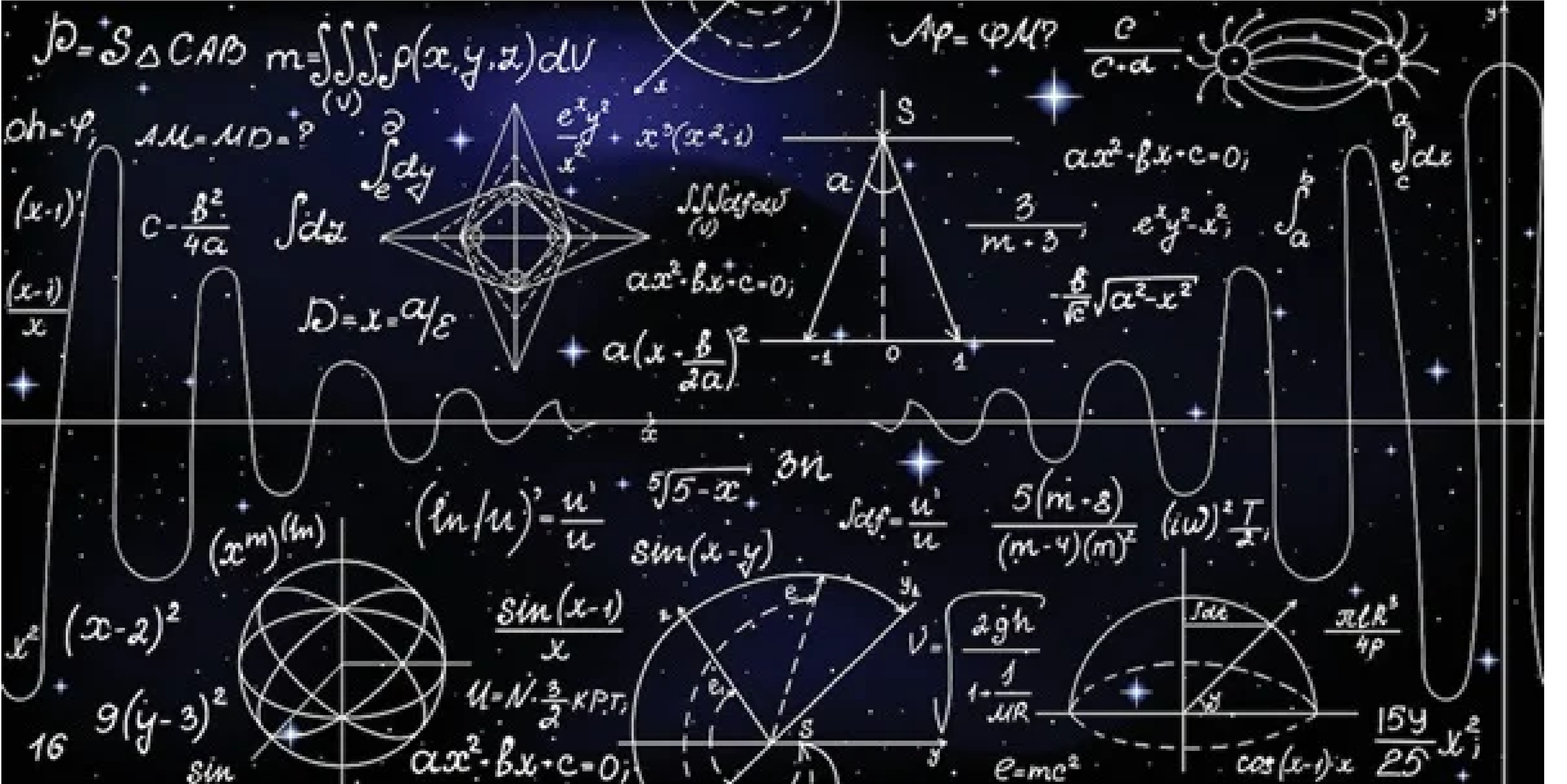
"বিজ্ঞানের অর্থ এক ধরনের বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি।..... বিজ্ঞান এক অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি যা একমাত্র প্রমাণের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেয়।" (Introduction to Science, Home University library Edition , p.58)

Francis Bacon (Father of Empiricism) এর ভাষায়,

"বিশ্বকে সত্যিকার অর্থে বোঝার একমাত্র উপায় হল সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।"

"সমস্ত প্রকৃত জ্ঞান ভিত্তি করে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির উপর।" [Novum Organum (1620)]

John Locke এর ভাষায়,

"No man's knowledge here can go beyond his experience." ("An Essay Concerning Human Understanding" (1689),Book IV, Chapter III, Section 6)

এখানে কোন মানুষের জ্ঞান তার অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারে না।

Galileo Galilei এর ভাষায়,

"In questions of science, the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual based on observation."{The Assayer" (1623)}

বিজ্ঞানের প্রশ্নে, পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির বিনয়ী যুক্তির কাছে হাজার হাজার ব্যক্তির কর্তৃত্বের মূল্য নেই।

উক্ত আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সংজ্ঞার ন্যায় প্রাচীন ভারতেও ব্যক্তি নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অনুমানপূর্বক জ্ঞান অর্জনের পন্থা ছিল যা বিষ্ণুভাগবতে উল্লেখ হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতেও "জ্ঞানের একমাত্র উৎস অভিজ্ঞতা" (বাণী ও রচনা দশম খন্ড)। আবার বিষ্ণু ভাগবতের একাদশ স্কন্দে সপ্তম অধ্যায়ে

পাই যে ভগবান দত্তাত্রেয় নিজ বুদ্ধি সহযোগে বা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, সূর্য, চন্দ্র ,ভ্রমর সহ ২৪ জন থেকে বা প্রকৃতির চারপাশ থেকে জ্ঞান লাভ করেন। বেদান্তসারের মতে বুদ্ধির পরিচয় হলো "বুদ্ধিঃ নাম নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ(৬৫)" অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিকে বুদ্ধি বলা হয়। কোন কিছুর সম্বন্ধে সঠিক ধারণাই হলো বুদ্ধি - ভাল মন্দ তারতম্য করার শক্তি। এই ধরনের বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব মহাভারতেও উল্লেখ আছে "যদ্বলানাং বলং শ্রেষ্ঠং তৎ প্রজ্ঞাবলমুচ্যতে" - সমস্ত বলের মধ্য শ্রেষ্ঠ বল বুদ্ধি বল (উদ্যোগপর্ব ৩৭/৫৫)। আধুনিক যুগেও দেখা যায় যে বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করতে। যেমনঃ- ১৯২৮-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করার পর Edwin P. Hubble এবং Milton Humason মাউন্ট উইলসন, ক্যালফোর্নিয়া, আমেরিকায় অবস্থিত "100 inch telescope" দ্বারা প্রমাণ করেন যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। যা আলোর গতির থেকেও বেশি গতিতে প্রসারিত হচ্ছে।

শুধু তাই নয় কোন প্রমাণকেও অন্য প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষা করার পন্থাও প্রচলন ছিল। ন্যায় দর্শনের ভাষায় একে বলা হয় প্রমাণ পরীক্ষা। ন্যায় দর্শনে উল্লেখ আছে, "প্রমেয়া চ তুল্য প্রামাণ্যবৎ || ২|১|১৬, যাহা প্রমাণ তাহা অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় তখন প্রমেয়ও (জ্ঞানের বিষয়) হয়। অর্থাৎ কোন প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে কারো সংশয় হলে তখন অন্য প্রমাণের দ্বারা উক্ত প্রামাণ্য নির্ণয়ে আবশ্যক হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইভাবে একটা বিষয়ের প্রমাণকে অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা বার বার যাচাই করাকে পরীক্ষা (Experiment) বলে। এই বিষয়ে জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা অব্যক্তের একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, "বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।.....যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়।" প্রাচীন ভারতে এই ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার পন্থাও প্রচলন ছিল। এই বিষয়ে চরক সংহিতার একটি উক্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। যেখানে বলা হয়েছে যে, "বেদ আপ্তাগম (শব্দ প্রমাণ) কিন্তু পর্যবেক্ষণ (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা) এবং প্রক্রিয়া (Experiment) দ্বারা নির্ণীত যে সমুদয় সিদ্ধান্ত পন্ডিতেরা পরীক্ষান্তে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও আপ্তাগমের তুল্য।" মনস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নানা দৃষ্টান্ত সহকারে প্রাচীন ভারতে অনুসৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন যা প্রণিধানযোগ্য। সেগুলো হলোঃ- প্রত্যক্ষীকরণ (perception), পর্যবেক্ষণ (observation),পরীক্ষা (Experimentation), পর্যবেক্ষণের হেত্বাভাস (Fallacy of Observation), অনুমিতি (inference) এবং প্রকল্প (Hypothesis)। যা প্রাচীন গ্রিক কর্তৃক বৈজ্ঞানিক আলোচনার সাদৃশ্য এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির অনুরূপ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে গণিতের অবস্থান সর্বাধিক। গণিতের ব্যবহার বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় ব্যবহৃত। হোক নিউটনীয়ান বলবিদ্যা হোক কোয়ান্টাম তত্ত্ব হোক তড়িৎচৌম্বক তত্ত্ব অথবা হোক আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব সর্বত্র ব্যবহার হয় গণিতের।

বার্ট্রান্ড রাসেল গণিতের সংজ্ঞা দিয়েছেন,

"গণিত হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যে বিজ্ঞান আলোচ্য বস্তু গুলির স্বরূপ আমাদের জানা নেই আর আলোচনা বাস্তব সম্মত কিনা তা নিয়েও কোনো মাথা ব্যাথা নেই।"

"গণিত বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত....যুক্তি আরও গাণিতিক হয়ে উঠেছে এবং গণিত আরও যুক্তিসঙ্গত হয়ে উঠেছে...... যুক্তি হল গণিতের যৌবন এবং গণিত হল যুক্তির পুরুষত্ব।" (Introduction to mathematical philosophy)

নীল ডিগ্রেস টাইশনের ভাষায়,

"গণিত হলো মহাবিশ্বের ভাষা। তাই আপনি যত বেশি সমীকরণ জানবেন তত বেশি আপনি মহাজগতের সাথে কথা বলতে পারবেন।"

শকুন্তলা দেবীর ভাষায়,

"গণিত ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবে না। তোমার চারপাশের সবকিছুই গণিত। তোমার চারপাশের সবকিছুই সংখ্যা।" (Interview with The Hindu,2013)

Dean Schlicter এর ভাষায়,

"যেকোনো কিছুর গভীরে যান, গণিত খুঁজে পাবেন।" (The Mathematical Experience by Davis and Hersh,1981)

প্রাচীন ভারতেও আধুনিক গণিতবিদের ন্যায় গণিতের গুরুত্ব সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানচর্চার একটা বিশেষ অংশ হলো গণিত। ভারতে গণিত চর্চা হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রিহিস্টরিক ইন্ডিয়া গ্রন্থে পিগট লিখেছেন:

"এই সূক্ষ্ম ভাবে নির্মিত মাপনীগুলির পিছনে আর শুধু মাপনী কেন, হরপ্পার সমগ্র নগর পরিকল্পনার পিছনেই ব্যবহারিক জ্যামিতি বিদ্যার ও জরিপ বিদ্যার সুগভীর এক জ্ঞান বর্তমান ছিল।"

কিন্তু গণিতের সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রকাশ করে বেদাঙ্গজ্যোতিষের এক জায়গায় উল্লেখ আছে,
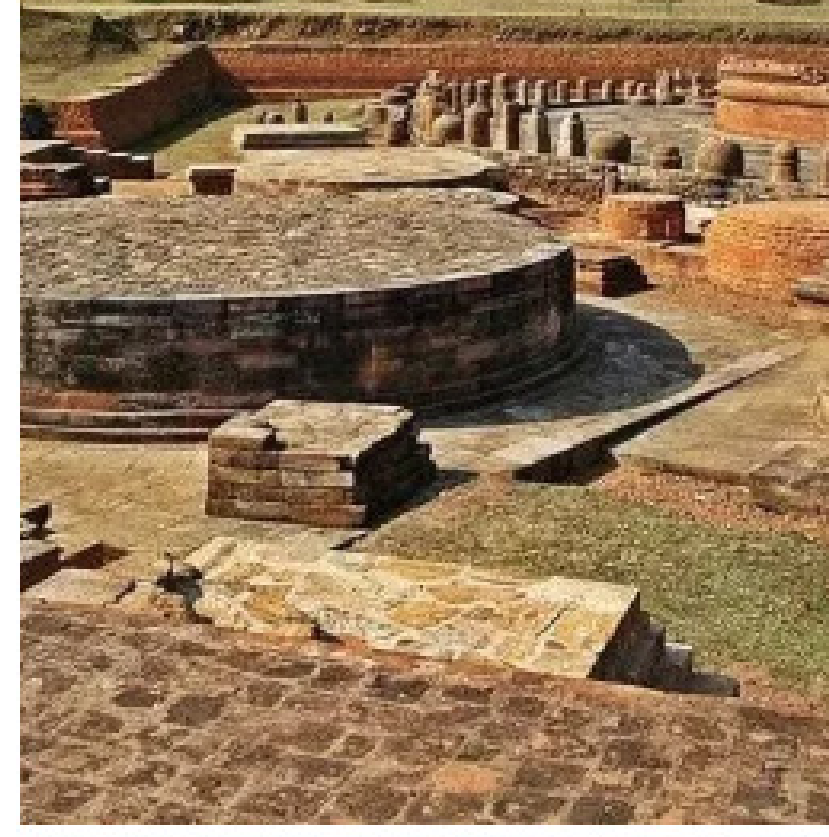
যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।

তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্ধনি স্থিতম্।।

অর্থাৎ ময়ূরের শিখার মতো এবং সাপের মণির মতো বেদাঙ্গশাস্ত্রগুলির (বেদ শাস্ত্র বোঝার জন্য যে অঙ্গ শাস্ত্র) শীর্ষদেশে গণিতের পরিস্থিতি। ছান্দোগ্যোপনিষদে অপরাবিদ্যার মধ্যে গণিতের শাখা নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতির্বিদ্যা) এবং রাশিবিদ্যা (পাটীবিদ্যা) রয়েছে। মুন্ডকোপনিষদে পরবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যার সহায়ক) হিসেবে গণিতাদি অপরাবিদ্যার কথা উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, অনুমান ও গাণিতিক যুক্তি প্রদর্শনের একটি উদাহরণ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। ভাষ্করাচার্য্য পৃথিবী কেন গোলাকার কিন্তু কেন গোলাকার সত্ত্বেও সমতল দেখায় সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, অনুমান ও জ্যামিতিক যুক্তি উপস্থাপন করে উল্লেখ করেছেন,

পৃথিবী যদি আয়নার মতো সমতল হতো তাহলে যে সূর্য বহু উপরে ও দূরে থেকে ভ্রমণ করছে তাকে দেবতারা যেইরূপ সব সময় দেখতে পায় মানুষেরা তেমন দেখতে পায় না। একটি বৃত্তের পরিধির শতভাগের এক ভাগকে (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে) যেমন এক বোধ হয় তেমনি মানুষ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর খুব সামান্য অংশ দেখতে পায় বলে তাকে

সমতল দেখায়।

তাই পরিশেষে বলাই বাহুল্য যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিশ্লেষণে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মনোভাব আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাদৃশ্যপূর্ণ। উক্ত কারণে প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বহু বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। যেমনঃ সুশ্রুত, চরক, জীবক, আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য, নাগার্জুন প্রমুখ বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভারতভূমিতে প্রাচীনকালে গঠিত হয় নালন্দা, তক্ষশিলা, শারদাপীঠের মতো বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। সনাতন ধর্মে ব্যক্তি নিরপেক্ষ বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুমান থেকে জ্ঞান লাভের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর যেই রূপে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন এই ধরনের চিন্তাধারা অন্য মতধারায় দেখা যায় না। যার ফলশ্রুতিতে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় কালে ভারতবর্ষ বাদে অন্য কোথায় কোন মানুষ যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন তাহলে তাঁদেরকে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্মের প্রত্যেকটা দর্শন সেটা হোক বেদ প্রামাণ্যবাদী দর্শন অথবা বৌদ্ধ,জৈন দর্শন এমনকি নাস্তিক চার্বাক দর্শনও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সত্য জ্ঞান লাভ করে সরাসরি নিজেদের প্রামাণ্যবাদের সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। ফলে প্রাচীন ভারতে যদি কেউ যৌক্তিক প্রমাণ সহ কথা বলতেন তবে এই ভারতের মাটিতে কখনো তাদের হেনস্তার স্বীকার হতে হয়নি। এই পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই স্বীকার করবেন, যে দৃশ্যমান জগতের মূল তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জানবার ইচ্ছা ভারতীয় ধর্মে বিশেষ করে সনাতন ধর্মে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে সনাতনীদের মধ্যে এইরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবণতা খুবই কম। তার একটা কারণ হয়তো বৈদেশিক আক্রমণে আক্রান্ত ও বহিরাগতদের হামলার ফলে নালন্দার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংস। যাই হোক পরিশেষে জগদীশচন্দ্র বসুর রচিত অব্যক্তের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা সমাপ্ত করব,

"কোনদিন কি আমাদের দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বর্ধিত হবে না যাঁহারা কেবল শ্রুতিধর না হইয়া স্বীয় চিন্তাবলে উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করিতে পারিবেন? ...... তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানশক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইত।..... তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে ? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ..... তক্ষশিলা, কাঞ্চি, নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? ..... সেই সৌভাগ্য যেন চিরস্থায়ী হয়, ইহা কি আমাদের অভিপ্রেত নয়? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিষ্য বৃন্দ ? ..... আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি যে চেষ্টার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়...... জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতোই অসম্ভব? " (অব্যক্ত - বোধন - মানসিক শক্তির বিকাশ)

তথ্য সংগ্রহঃ

১) শ্রীমদ্ভাগবতম বা বিষ্ণুভাগবতম - গীতাপ্রেস
২) বিজ্ঞান ও ধর্ম - স্বামী রঙ্গনাথানন্দ
৩) অব্যক্ত - জগদীশচন্দ্র বসু
৪) প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা - শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার
৫) ন্যায় পরিচয় - শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
৬) ভারতদর্শনসার - শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৭) দর্শনপরিচয় - শ্রীগোপাল চন্দ্র সেন
৮) ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস - শ্রীতারক চন্দ্র রায়
৯) ChatGPT
১০) উইকিপিডিয়া
১১) ভগবদ্গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা - স্বামী রঙ্গনাথানন্দ
১২) বেদান্তসার - স্বামী অমৃতত্বানন্দ
১৩)মহাভারত - হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
১৪)প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস - ডঃ. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
১৫)প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা - রমাতোষ সরকার

সনাতন শাস্ত্রে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা

রাজ নারায়ন

আজকাল অনেকেই বলে থাকেন সনাতন শাস্ত্রে নারীকে কোন অধিকার বা মর্যাদা দেওয়া হয় নি। এমনকি তারা এও বলেন হিন্দুধর্মে নারীকে সম্পত্তির অধিকার, মৌলিক অধিকার এমনকি মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন দেখা যাক শাস্ত্রীয় সমীক্ষা কি বলে নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে।

মনুসংহিতা দ্রষ্টব্য :

নারীকে সম্মান ও পূজা করার বিধান :

যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্ত ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ। (মনুসংহিতা ৩/৫৬)

অনুবাদ : যে বংশে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালাঙ্কারাদির দ্বারা পূজা বা সমাদর প্রাপ্ত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে বংশে স্ত্রীলোকদের সমাদর নেই, সেখানে (যাগ, হোম, দেবতার আরাধনা প্রভৃতি) সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়ে যায়।

নারী নির্যাতন কারী ব্যক্তি ও বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় :
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা।। (মনুসংহিতা ৩/৫৭)
অনুবাদ : যে বংশে ভগিনী ও গৃহস্থের সপিণ্ড স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ভূষন- আচ্ছাদন - খাদ্যাদির অভাবে দুঃখিনী হয়, সেই বংশ অতি শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

স্ত্রীলোকদের সম্মানের মাধ্যমেই পরম সিদ্ধি লাভ সম্ভব :
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ।। (মনুসংহিতা ৩/৫৯)
অনুবাদ : অতএব যারা ভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য বা সম্পদ কামনা করে, এইরকম পতিসম্বন্ধীয় লোকেরা (উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি) বিভিন্ন সৎকার্যের অনুষ্ঠানে এবং নানা উৎসবে অলঙ্কার, বস্ত্র ও ভোজনাদির দ্বারা নিত্য স্ত্রী - লোকদের পূজা বিধান করবে।

নারীজাতির পিতৃ সম্পত্তিতে অধিকার :
স্বেভ্যোঽংভ্যস্ত কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।
স্বাৎ স্বাদংশচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ।। (মনুসংহিতা ৯/১১৮)

অনুবাদ : ভ্রাতারা স্বজাতীয় অতিবাহিত ভগিনীগনকে নিজ নিজ অংশ থেকে চতুর্থ ভাগ ধন পৃথক করে দান করবে ; যদি তারা দিতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে তারা পতিত হবে।

ভগবান নারীকে নিজের স্বরুপ বলছেন :
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমত্ত্বশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।। (শ্রীমদভগবদগীতা ১০/৩৪)
অনুবাদ : নারীগনের মধ্যে আমিই কীর্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা।
এছাড়াও নারী শক্তির পূজা একমাত্র হিন্দু ধর্মেই করা হয়ে থাকে। হিন্দু ধর্ম নারীকে সকল প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করে কিন্তু অশ্লীলতা সমর্থন করে না। এমনকি প্রাচীনকালে গার্গী, উভয়ভারতী প্রভৃতি নারী দের জ্ঞানের পরিধি দেখে সহজেই উপলব্ধি করা যায় বৈদিক যুগ হতেই নারীরা কতটা সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু এখন এই অশ্লীল সংস্কৃতির প্রভাবে নারী দের স্বাধীনতার অপপ্রয়োগে অনুপ্রানিত করা হচ্ছে। দয়া করে কেও ওইসব অশ্লীল স্বাধীনতাবাদীদের কথায় কান দেবেন না। আমরা চাই নারী নির্যাতন মুক্ত দেশ গড়তে। আমরা চাই নারী জাতি তার মাতৃত্বকে বিসর্জন না দিয়ে মাতৃত্বের সাধনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। নারী জাতিকে হিন্দু ধর্মে দেবী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই কোন অধার্মিক বা তথাকথিত ভদ্র বাবুদের কথায় কান দিয়ে নিজেকে মিথ্যা স্বাধীনতার জালে আবদ্ধ করে অন্যের ভোগের সামগ্রীতে নিজেকে পরিণত না করে চলুন বৈদিক রাজ্য গঠন করি।
হরি ওম।

‘ভক্ত সুদামা ও দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ’

বিত্ত সোম

ভাগবতপুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামার মিত্রতার সম্পর্কের এক অতীব সুন্দর ও ভক্তিমূলক উপাখ্যান রয়েছে। সে সময় সন্দীপনি আশ্রম ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের উজ্জয়িনী তে অবস্থিত ছিল । এবং সন্দীপনি আশ্রমই ছিল শ্রীকৃষ্ণ , বলরাম এবং সুদামার শিক্ষাগ্রহণের স্থান । পরবর্তীতে অধ্যয়নের মধ্য থেকেই শ্রী কৃষ্ণ ও সুদামার মিত্রতার সম্পর্কের প্রারম্ভ হয় । কিন্তু এ সম্পর্ক শুধুমাত্র মিত্রতার জালে আটকে থাকেনি । ধীরে ধীরে সুদামার চোখে শ্রী কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন স্বয়ং ভগবান ।
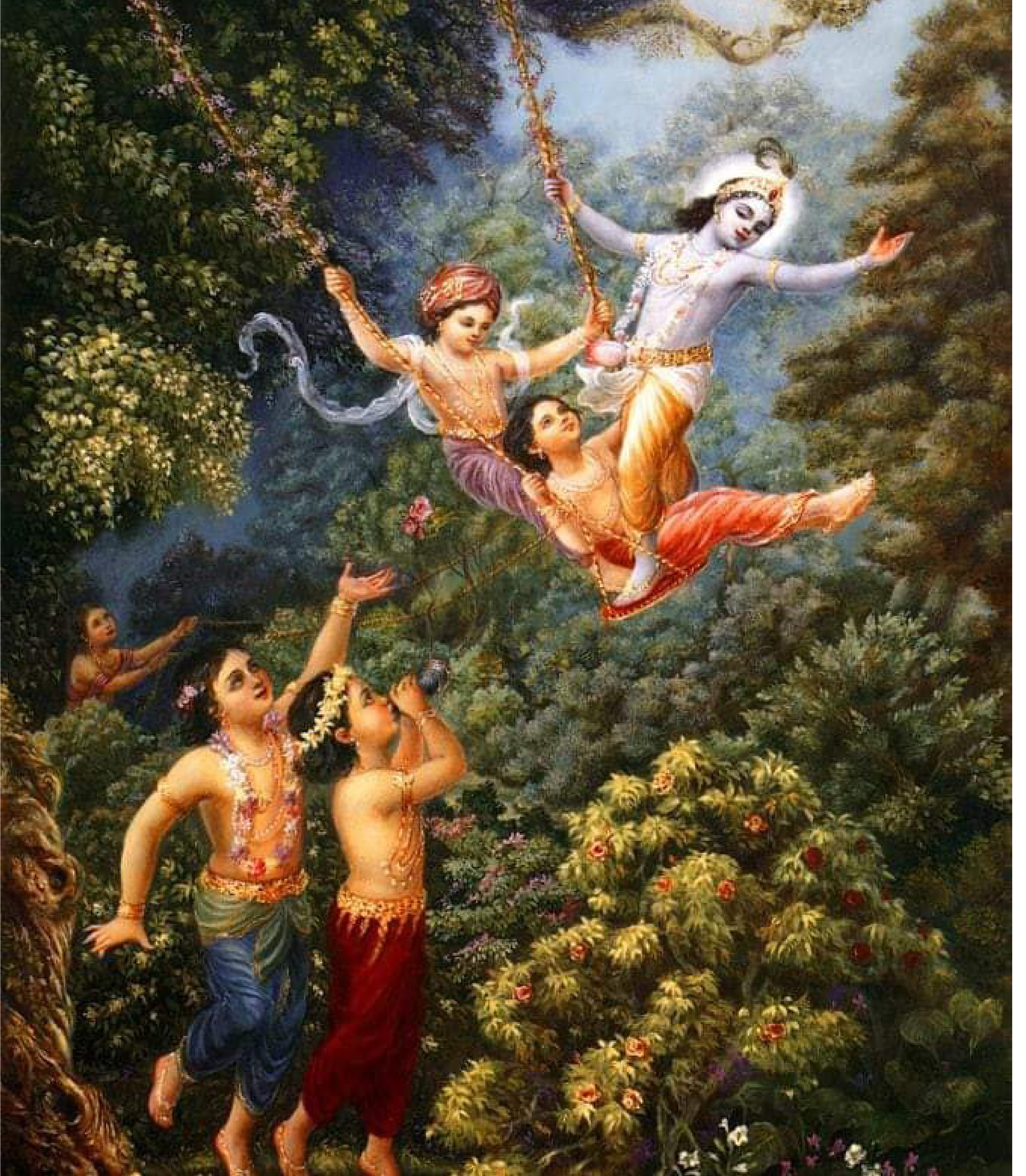
একদিন আশ্রমগুরু সন্দীপনি মুনি শিষ্যদের পাঠালেন জঙ্গলে । এবং বললেন জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে । গুরুর নির্দেশ মাত্রই শ্রী কৃষ্ণ এবং সুদামা বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলের উদ্দেশ্যে । জঙ্গলে পৌঁছতেই কাঠ সংগ্রহ করতে শুরু করলো দুজনে । কিন্তু হঠাৎই ইন্দ্রদেবের প্রবল ক্ষমতার সম্মুখীন হলো দুজনে । প্রচন্ডভাবে ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো । ফলে অপরূপ আকাশ পরক্ষণেই একদম কালো মেঘে ছেয়ে গেল । গভীর অরণ্যের মধ্যেই দিকভ্রষ্ট হলো দুজনে । ঝড়ের গতিপ্রবাহ দেখতে দেখতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে রাত নেমে এলো । ওদিকে সুদামার পেটে অসম্ভব ক্ষুধা লাগছিল । তখন তার মনে পরে গুরুপত্নী কিছু চিড়ে দিয়েছিলেন তার ঝুলিতে । আর কিছু না ভেবে সে খেতে আরম্ভ করে ।

কিন্তু লজ্জায় ও সংকোচে সুদামা শ্রী কৃষ্ণ কে কিছুই বলেনি । কিন্তু শ্রী কৃষ্ণ তো স্বয়ং ভগবান তাই তার কাছে কিছুই অজানা রইলো না । তিনি সুদামার কাছে গিয়ে বললেন , কি 'হে মিত্র লুকিয়ে লুকিয়ে কি আহার করা হচ্ছে । সুদামা সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো , হকচকিয়ে বলল , না না মিত্র এই জঙ্গলে আমি কোথা থেকে খাবার সংগ্রহ করবো বলো । সুদামার বলা বাক্যের পর শ্রী কৃষ্ণ আর কিছু বললেন না ।

এবং এভাবেই তারা গুরুগৃহে শিক্ষা সম্পন্ন করে বিদায় নেন ।

সময়ের সাথে সাথেই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে ওঠেন দ্বারকারাজ । এবং সুদামা সংসার জীবনে

প্রবেশ করে চরম দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অনেক সংগ্রাম করে জীবন যাপন করতে থাকে । ব্রাহ্মণদের জন্য শাস্ত্রে প্রতিদিন শুধুমাত্র পাঁচ ঘরে ভিক্ষে চাওয়ার বিধান রয়েছে । এই পাঁচ ঘর থেকে ভিক্ষে যদি না দেয়া হয় তাহলে সারাদিন তাদের অভুক্তই থাকতে হয়।

তাই একদিন সুদামা নিজের এবং পরিবারের ক্ষুধা নিবারণের জন্য পা রাখলো এক গৃহস্থের ঘরে। দরজায় কড়া নাড়তেই কিছুক্ষন পর এসে দরজাটি খোলা হলো। সুদামা তখন বলে উঠলো , মা আমি এবং আমার পরিবার অভুক্ত । কিছু ভিক্ষে দিয়ে সাহায্য করো মা । ভগবান তোমার সহায় হবেন ।

সুদামার কথায় সামনে থাকা দেবী যেনো ক্রোধে দাবানলের ন্যায় ফেটে পড়লেন। রাগান্বিত কণ্ঠেই বললেন , আহ সাত সকালেই ভিক্ষের জন্য উদয় হয়েছে । এদের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই । সারাদিন শুধু ভিক্ষে দাও মা ভিক্ষে দাও ।

সুদামা কান্নার্ত কণ্ঠে হাত জোড় করে বলল, এভাবে বলো না মা । তোমরা সাহায্য না করলে তো আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাবো ।

" তাতে আমার কি । আর এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে এবার ফিরে যান ।
তবুও সুদামা শেষবারের মতো চেষ্টা করলো ।
" এমন করো না মা । কিছু অন্তত ভিক্ষে দাও ।

এবার আর গৃহিণী কিছু না বলে নিজের কার্যের দ্বারা আসুরিক মনমানসিকতার পরিচয় দিল । এক ধাক্কা দিয়ে সুদামা কে মাটিতে ফেলে দিলো । ব্যথায় তীব্র চিৎকার করে উঠলো সুদামা । কাতর কণ্ঠে জিহ্বা থেকে বেড়িয়ে এলো একটি বাক্য " হে কৃষ্ণ " তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলল , হে শ্রী কৃষ্ণ আর কত পরীক্ষা নিবে আমার । পরিবারের মুখে দুবেলা দু-মুঠো অন্ন তুলে দেয়ার সামর্থ্য ও নেই আমার ।
এই বলে আরো জোরে কাঁদিতে শুরু করলো সুদামা । পরবর্তী চারটি গৃহ থেকেই তুচ্ছ এবং তাচ্ছিল্যের শিকার হলো সুদামা । নিয়তির লিখনে সেদিন ও ভর্তি হলো না সুদামার ঝুলি । শূন্য হাতেই বাড়ি ফিরতে হলো তাকে ।

পরবর্তী দিনে ক্ষানিকটা সন্তুষ্টির অধিকারী হলো সুদামা । এক গৃহে গেলেন এবং ভিক্ষার জন্য এক মাকে বলল , "ভিক্ষাং দেহি মাতা" ব্রাহ্মণ কে কিছু সাহায্য করে কৃতার্থ করুন। বাকি চারটে ঘর থেকে আমি কিছুই পাই নি । আপনিও যদি আমাকে ফিরিয়ে দেন তাহলে পরিবারকে নিয়ে আজকেও আমাকে অভুক্ত থাকতে হবে ।
সুদামার কথায় যেনো মাতার মন গলিত হলো । তার চোখেও দেখা গেলো অশ্রু বিন্দু । নিজ আঁচল দিয়ে চোখের অশ্রু মুছে বলল , না ব্রাহ্মণ দেবতা আমি আপনাকে খালি হাতে ফিরাবো না । আজ গৃহে পায়েশ ও লুচি বানিয়েছি আমি আপনাকে তাই দিচ্ছি ।

সুদামা সন্তুষ্টি সহিত বলল , ঠিক আছে মাতা ।

এই বলে মাতা অন্যত্র গৃহে প্রবেশ করে কিছুক্ষনের মধ্যে পায়েশ ও লুচি নিয়ে সুদামার সামনে এসে উপস্থিত হলো । তারপর পরমান্নে সুদামার ভিক্ষার পাত্র একদম ভরিয়ে দিলো ।

তারপর সুদামা মাতাকে বিদায় জানিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে চললো । কিন্তু পথে হলো আরেক তাজ্জব ঘটনা । এক কুকুর তাড়া করলো সুদামাকে । দৌড়তে দৌড়তে একপর্যায়ে সুদামা হোঁচট খেয়ে মাটিতে পরে গেলো । ক্ষানিকটা কেটেও গেলো কপালের দিক থেকে । ভিক্ষার পাত্র মাটিতে পড়ে ভেঙে গেলো সঙ্গে সঙ্গে । তারপর মাটিতে পরে থাকা সেই পরমান্ন, কুকুরটি খেতে থাকলো ।

সুদামা দুঃখী মনে বলল , কদাচিৎ এই খাবার আমার পরিবারের ভাগ্যে হয়তো ছিল না । এই বলে উদাস মনে বাড়ি ফিরল সুদামা । বাড়িতে প্রবেশ মাত্রই সুদামার স্ত্রী সুশীলা তার হাত শূন্য দেখে বললেন , স্বামী আজও তো তুমি কিছু পেলে না এখন শ্রী কৃষ্ণ কে আমরা কি দিয়ে ভোগ দিবো । হাঁড়িতে তো শুধুমাত্র একটি দানা অবশিষ্ট পরে আছে ।

সুদামা তখন বলল , ওই একটি দানা দিয়েই তুমি আমার ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করে । দেখবে তিনি তাতেই সন্তুষ্ট হবেন ।

তারপর সেই একটি ভাতের দানা দ্বারাই শ্রী কৃষ্ণ কে ভোগ নিবেদন করা হলো । তারপর সুশীলা কাতর কণ্ঠে সুদামার কাছে অনুরোধ করলেন ,

“তুমি তো শ্রী কৃষ্ণের পরম মিত্র” । ভক্তের দুরবস্থা ভগবান কখনোই সহ্য করতে পারে না । তুমি একবার হলেও তার সাথে দেখা করো । তার কাছে সাহায্যের জন্য যাও।

সুশীলার কথায় প্রথমে সুদামা রাজি হলো না । তিনি ভাবলেন , বন্ধুত্ব কখনো স্বার্থপরতার মোহে কলুষিত হতে পারে না । কিন্তু পরক্ষনেই পরিবারের কষ্ট এবং দুরবস্থার কথা মনে এল তার। এভাবে নানা কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে পার করতে লাগলো সুদামা ও তার পরিবার। বাল্যসখা কে বহুদিন যাবত দেখেওনি সে, বিভিন্ন কিছু চিন্তা করে ঠিক করলেন দ্বারকায় যাবেন। কিন্তু দ্বারকা যে বহুদূর। তার উপরে অবস্থা এতই খারাপ ঘরে অন্ন বলতেও কিছু ছিলনা।

তারপর সুশীলাকে বলল , কোনো প্রকার উপহার না নিয়ে গেলে কেমন দেখাবে সুশীলা । সুদামার বলা কথামাত্রই সুশীলা অনেক কষ্টে কিছু শুকনো চিড়ে সংগ্রহ করলেন এবং কাপড়ের পুটলীতে বেঁধে দিয়েছিলেন সুদামাকে । যেনো তিনি শ্রীকৃষ্ণ কে উপহার স্বরূপ দিতে পারেন ।

তারপর দ্বারকার উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করে সুদামা । কিন্তু যাত্রা পথও ততটা সহজ হয়নি । দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো সুদামা। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর পার করেও দ্বারকায় পৌঁছাতে পারেনা সে। মাঝে কেটে গেছে অনাহারে বহুদিন। তার উপরে দীর্ঘ পথযাত্রার ক্লান্তি। কিন্তু তার চেয়েও প্রবল ছিল বন্ধু কৃষ্ণের সঙ্গে একবার দেখা করার প্রবল ইচ্ছা ও বাল্যসখার প্রতি ভালোবাসা। ভগবানকে কাছে পেতে হলে যেমন কষ্ট করতে হয় ঠিক তেমনই কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সুদামাকে । সূর্যদেবের তেজে পথ তখন উনুনের মতো গরম হয়ে আছে । তার উপরেই খালি পায়ে হেঁটে চলেছে সুদামা । একপর্যায়ে তার পায়ে ফোসকা পরে গেলো । কিন্তু তারপরও সুদামা হেঁটে চলেছে । মাঝে মাঝে পথে পরে থাকা পাথরের সাথে ঘর্ষণে ক্ষানিকটা কেটেও যাচ্ছে এবং তা থেকে ঝরছে লাল রক্ত । লাল রক্তে সুদামার পা একদম মেখে গিয়েছে । কিন্তু তারপরও সে হেঁটেই চলেছে।
হাঁটতে হাঁটতে একপর্যায়ে তিনি পথে কয়েকজন ব্যক্তির দেখা পান । সাহায্যের জন্য সুদামা তাদের কাছে ছুটে যান । কিন্তু ব্যক্তিরা সুদামাকে দেখে একদম হকচকিয়ে যায় । কারণ সে সময় সুদামার অবস্থা ছিল একদম নাজেহাল । যা চোখে দেখার মতোও নয় । ঘামে শরীর একদম ভিজে গিয়েছে । পা থেকে সমানে বেরিয়ে চলেছে রক্ত । সবশেষে সুদামা বলল , ভাই দ্বারকা নগরী আর কতদূর বলতে পারো ।

“এইতো নাক বরাবর হাঁটলেই দ্বারকা নগরী কিন্তু ব্রাহ্মণ মশাই আপনি ওখানে গিয়ে কি করবেন ।

“ শ্রীকৃষ্ণ আমার মিত্র হয় গো । তাই তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি ।”

সুদামার কথা শুনে ব্যক্তিরা একদম হেসে উড়িয়ে দিলো। তাচ্ছিল্য সহিত সুদামাকে বলল , শোনো ব্রাহ্মণের কথা

দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ নাকি তার মিত্র।

এই বলে আবারো হাসতে শুরু করলো তারা।

" আমি সত্যি বলছি গো। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করো।"

" না ব্রাহ্মণ মশাই দেখছি একদম পাগল হয়ে গিয়েছেন।"

আর তাচ্ছিল্যের শিকার না হয়ে নাক বরাবর হাঁটতে শুরু করলো সুদামা। অবশেষে বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে দ্বারকায় পৌঁছালেন সুদামা। নগরে প্রবেশ করে দেখলেন নগরের মধ্যে বিশাল রাজপ্রাসাদের চূড়া দেখা যাচ্ছে। কান্নায় ভেঙ্গে পরলেন সুদামা। মাটিতে গড়াগড়ি করতে লাগলেন। নগরে প্রবেশ করতে বুঝলেন এই নগর যেনো বৈকুণ্ঠধাম। কোনকিছুর অভাব নেই নগরে। চারিদিকে শ্রী ও সমৃদ্ধি নগরে সদাস্থিত।

সুদামার প্রবেশের সাথে সাথেই শ্রীকৃষ্ণর উতলা হয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলেন যে তার মিত্র সুদামা এসেছে ।

সুদামার মনে বিবেচনা এলো, এই সমৃদ্ধ নগরীর সম্রাটের কি আমার কথা মনে আছে আদৌ। আমার মতো দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি তার মিত্র হওয়ার যোগ্য? সুদামা তবুও মন স্থির করে যখন এসে পড়েছে তখন দেখা না করে যাবে না। যখন মহলে প্রবেশ করতে যাবে, এমন সময় তার সামনে ঠিক পাহাড়ের ন্যায় এসে দাঁড়ায় দুই প্রহরী । সুদামাকে জিজ্ঞেস করে , কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

সুদামা নমনীয় সুরে বললেন , আমি আমার মিত্রের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি ।

" কে আপনার মিত্র?"

" শ্রীকৃষ্ণই যে আমার মিত্র।"

কথাটি শোনামাত্রই যেনো প্রহরী রুদ্রমূর্তি ধারণ করলো । কড়া গলায় বললেন , এত বড় দুঃসাহস আপনার আপনি দ্বারকাধীশ শ্রী কৃষ্ণকে আপনার মিত্র বলে সম্বোধন করেন ।

" তোমরা বিশ্বাস করো ভাই । আমি সত্যি কথা বলছি । শ্রীকৃষ্ণ এবং আমি বাল্যকালের মিত্র।"

" আবারো সেই এক কথা বলছেন । আপনি এখনই এই স্থান ত্যাগ করুন।" তবুও সুদামা ঐ স্থান ত্যাগ করছে না দেখে সম্মুখদ্বার থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় দ্বাররক্ষী।

সুদামার চোখ ফেটে ঝরছে তখন নিরন্তর অশ্রুর বারিধারা । এতকাছে এসেও মিত্রের দেখা না পাবার যে অসহ্য যন্ত্রণা তা এখন অনুভব করছে সুদামা । সবশেষে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবারো ফিরে যেতে লাগলেন সুদামা । কিন্তু তখনই তিনি শুনতে পেলেন অতি পরিচিত একটা কণ্ঠ।
"সুদামা ও সুদামা"
যখন তিনি পিছনে ফিরলেন তখন দেখলেন তার মিত্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছুটে ছুটে তার দিকেই আসছেন । তারপর এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণ , আমার প্রিয় মিত্র । এতদিন তুমি কোথায় ছিলে । সুদামা – কৃষ্ণ দুজনের চোখেই নিরন্তর বয়ে চলেছে অশ্রুধারা। সুদামা কানাই সম্বোধন করে সংকোচে সরে যাচ্ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মিত্রকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে আসেন প্রাসাদের মধ্যে। তারপর সুদামা শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে আসন গ্রহণ করেন রাজসিংহাসনে । তারপর শ্রীকৃষ্ণ নিজ হাতে মিত্রের পা ধুয়ে দেন পরম যত্নে।
রাণী রুক্মিণী তখন বিস্মিত হয়ে দেখলেন আর ভাবতে লাগলেন, শ্রীকৃষ্ণ জগৎ সংসারের সবকিছু ভুলে গিয়ে শুধু তার পরম মিত্রেরই সেবা করছেন । কি এমন মহিমা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামার।
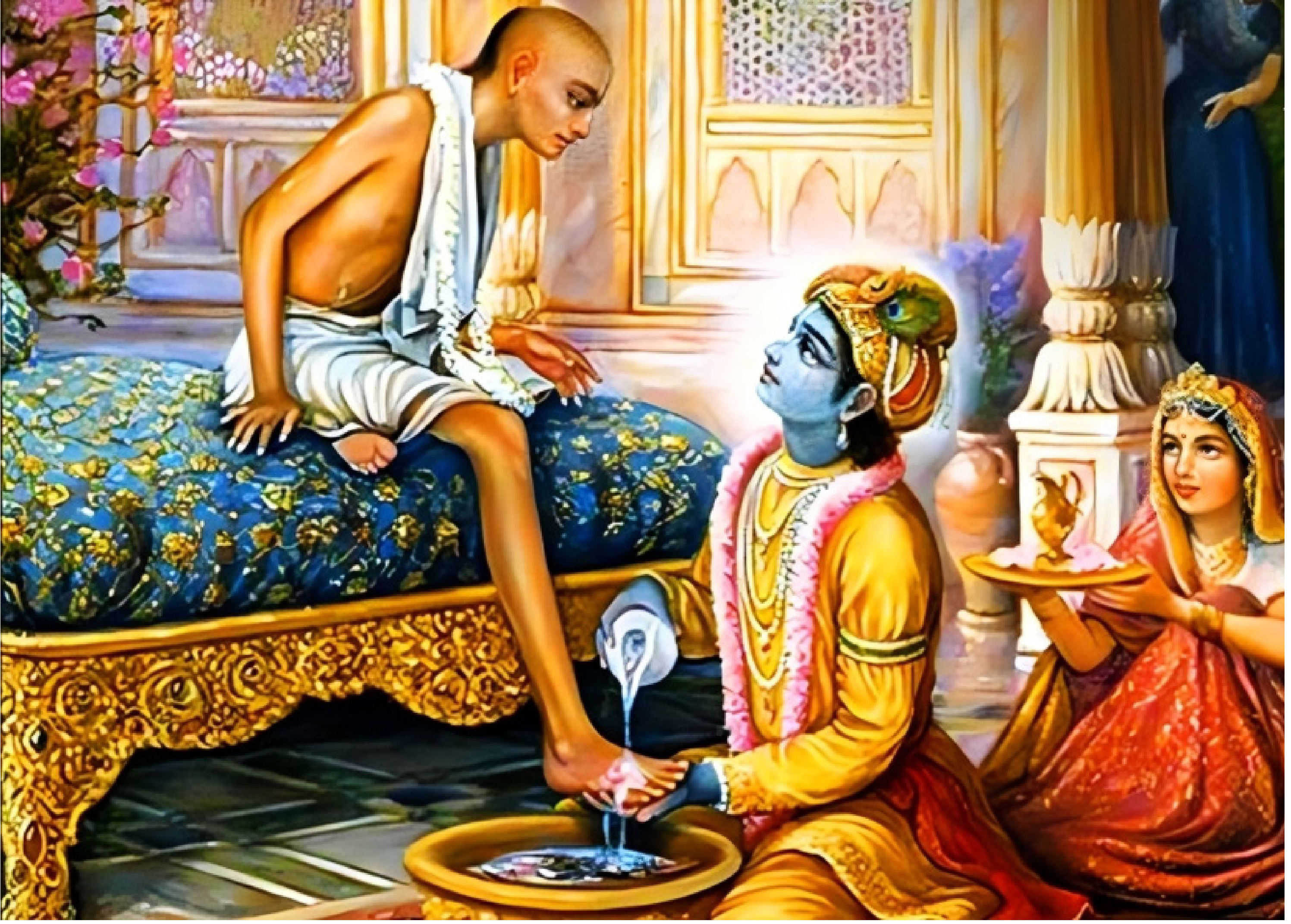
তারপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন , মিত্র আমার জন্য কি উপহার এনেছো ।

সুদামা তখন সংকোচ বোধ করলো । সংকোচে তিনি উপহার দিতে চাইছিলেন না । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চেহারা দেখেই সব বুঝতে পারেন। এবং নিজেই সে তার কাপড়ের পুটলি থেকে সুশিলার পাঠানো চিড়া বের করে মুখে দিলেন । রুক্মিণী দেখলেন শ্রী কৃষ্ণের একবার মুখে দেয়াতেই সুদামার বাড়ি ঘর ধনসম্পদে একদম ভরে গিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয়বার যখন মুখে দিতে যাবেন তখন রুক্মিণী তাকে আটকালেন । কারণ রুক্মিণী জানতেন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং নারায়ণ । এবং সুদামাকে একবারেই সংসারের সমস্ত অভাব দূর করে দেয়া হয়েছে । দ্বিতীয় বারে বৈকুণ্ঠধামও কিনা তার হয়ে যায় এই ভয়ে ।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর দিকে তাকিয়েই সবটা বুঝতে পারলেন । তারপর একটা মুচকি হাসির মাধ্যমে খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন ।

তারপর সুদামাকে বিশ্রামের জন্য অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হলো । সেখানে পুষ্পসজ্জিত পালঙ্কের ওপরে তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হলো। ব্যবস্থা করা হলো তার জন্য রাজকীয় পোশাকাদির। কিন্তু সুদামা দরিদ্র ব্রাহ্মণ । পালঙ্কে বিশ্রামে অভ্যস্ত তিনি নন । তাই সবাই যেতে তিনি পালঙ্কের নিচেই বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লেন । কারণ তার কাছে ধণ , সম্পত্তি , প্রতিপত্তি সবই এই জড় জগতের মোহ মাত্র আর কিছুই নয় । তিনি শুধু এসেছিলেন তার পরম মিত্র শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে ।

জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যখন সব কিছু শেষ হয়ে যাবে মনে হয়, তখনও আমাদের আস্থা রাখা উচিত করুণাময়ের প্রতি। নিঃস্বার্থ ভাবে সত্যিকারের ভক্তি কখনোই ব্যর্থ হয় না। এক দিন না এক দিন, আপনার ভক্তি এবং নিষ্কলঙ্ক ভালোবাসার ফলস্বরূপ ভগবান মুখ তুলে তাকাবেন। শুধু ভক্তি করে যেতে হবে বাধাহীন ভাবে।

সরস্বতীর চরণে সরস্বতীর অঞ্জলী

নিরঞ্জন চন্দ্র দাস

বসন্তের বাতাসে বয়ে যায় আনন্দের দোলা,
সরস্বতী মা আসবে বসে তাই সোনামনিদের কিচিরমিচির মেলা।

আসবে সরস্বতী সাথে বাহন রাজহাঁস,
অঞ্জলী নেওয়ার জন্য মামনিরা থাকবে উপবাস।

লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট সরস্বতীরা খাবে সন্দেশ আর পায়েস,
মায়ের বকুনি থেকে বাঁচার জন্য ঘুমিয়ে করবে আয়েশ।

পূজার আনন্দে পড়াশোনা করবে সবাই কামায়,
কিছু বললেই বলবে মা সরস্বতী পড়তে মানা করেছে আমায়।

আকাশে বাতাসে আবেগ আর আনন্দ,
শিশুদের গায়ে যেন সরস্বতী গন্ধ।

মণিময় চোখে সাজে কাজলের কালি,
শাড়ি পড়া ছোট মেয়ে গুলো সাথে পুষ্পডালি।

মূর্তিতে ফুল চন্দন দীপ ধূপ জ্বলে,
ভালোবাসা কথা বলে উৎসব স্থলে।

যথা তথা গুচ্ছ যেন কমলের দল,
আনন্দে সবাই করে আত্ম কোলাহল।

কর্ম করে প্রতিজনই যে যার মতো,
অঞ্জলিতে প্রতিজ্ঞা লয় কয়েক শত!

দ্রুতলয়ে দিন কাটে আনন্দের মাঝে,
প্রসাদেতে মন ভরে আলো এলো সাঁঝে।

ক্লান্ত তনু তরতাজা প্রতিমার বেশে,
অক্ষয় স্মৃতি লয়ে ফিরে ঘরেতে শেষে।

‘সহজ ভাবে সংস্কৃত শিক্ষা’

সংস্কৃত শব্দ	সংস্কৃত বাক্য
अहम् (aham, অহম্) - আমি (I) मम (mama, মম) - আমার (My) त्वम् (tvam, ত্বম) - তুমি (You) भवतः (bhavatah, ভবতহ্) - তোমার .পুং (Your) भवत्याः (bhavatyaha, ভবত্যাহ্) - তোমার .স্ত্রী(Your) नाम (nam, নাম) - নাম (Name) किम् (kim, কিম্) - কি (What)	भवतः नाम किम्?/ भवतः नाम किमस्ति? - পুং - তোমার নাম কি? भवत्याः नाम किम्?/ भवत्याः नाम किमस्ति? - স্ত্রী - তোমার নাম কি? (কিম্ এর সহিত অস্তি যুক্ত করেও প্রশ্ন করা যায়, এক্ষেত্রে কিমস্তি বাকি উচ্চারণ শব্দের উচ্চারণের মতোই) अहम् रामः(রামহ্) - আমি রাম मम नाम रामः/मम नाम रामः अस्ति (অস্তি) আমার নাম রাম

কোর্সে Enroll করতে Qr Code টি স্ক্যান করুন

Sacn for Enroll
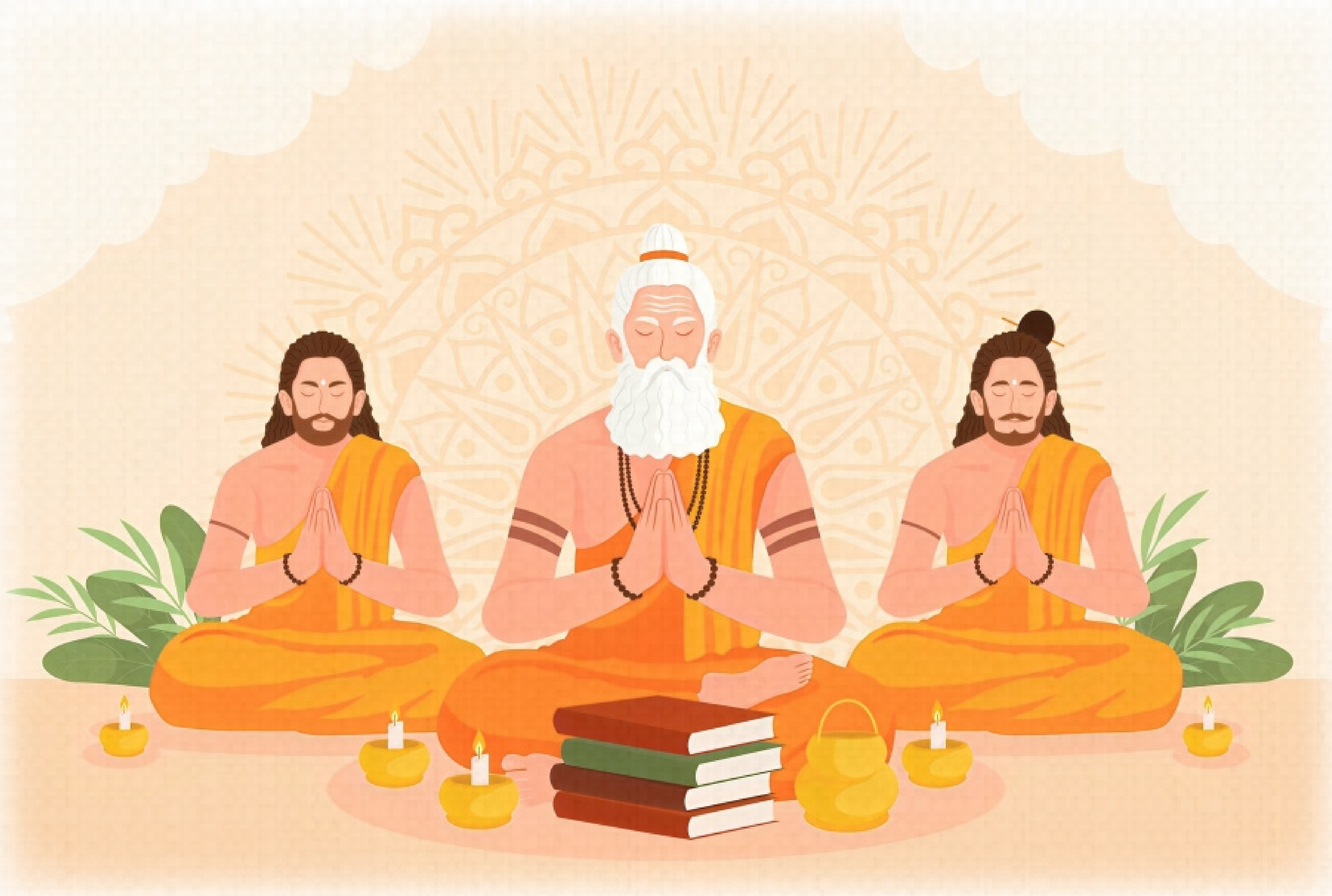
আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১: "নিজের স্ত্রী ব্যাতিত সকল নারীদের মা ও বোনের দৃষ্টিতে দেখতে হবে "- এটা সনাতন ধর্মের কোন শাস্ত্রে বলা আছে?

উত্তর: অপরিচিতা পরস্ত্রীকে মা, ভগিনী বা কন্যা বলিয়া সম্ভাষণ করিবে। (বিষ্ণুসংহিতা ৩২/৭)
পরস্ত্রী ও যে স্ত্রী মাতৃবংশীয় বা পিতৃবংশীয় নন (অর্থাৎ যাঁর সাথে কোনও রকম রক্ত সম্পর্ক নেই), তাঁর সাথে সম্ভাষণের প্রয়োজন হ'লে তাকে 'ভবতি, সুভগে বা ভগিনী বলে সম্বোধন করবেন। (মনুসংহিতা২/১২৯)

প্রশ্ন ২: শাস্ত্রে গৃহস্থের জন্য পাঁচ টি মহাযজ্ঞের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেখানে পিতৃযজ্ঞ অন্যতম। পিতৃযজ্ঞের উদ্দেশ্যে তর্পনের বিধান আছে। প্রতিদিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে কি তিল এবং জল প্রদান করা যায় নাকি শুধু তৃতীয়াতেই তিল এবং জল প্রদান করা যায়?
তর্পন বিধি কি?
বি.দ্র: (আমাদের বংশ পরম্পরায় শুধু বিয়ে এবং কারো মৃত্যু হলেই একমাত্র তিল দান করতে দেখেছি)

উত্তর: সংক্রান্তি, রাত্রিকাল, সপ্তমী তিথি, রবি ও শুক্রবার, শ্রাদ্ধদিনে এবং জন্মদিনে তিলতর্পণ করিবে না। ইহা সামান্য বিধি। কিন্তু নিম্নোক্ত বিশেষ বিধি অনুসারে নিষিদ্ধ দিনেও তিল তর্পণ করা যায়, যথা-
অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ। উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে। সূর্য্যশুক্রাদিবারেহপি ন দোষস্তিলতর্পণে। তীর্থে তিথিবিশেদে চ কার্য্যং প্রেতে চ সর্ব্বদা ॥
দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, গ্রহণ, সংস্কারপূর্ব্বক বেদারম্ভাদি কার্য্যে, উৎসর্গে, যুগাদ্যা ও মৃততিথিতে যদি শুক্রাদি নিষিদ্ধ বার হয়, তাহা হইলেও তিলতর্পণে দোষ হয় না। তীর্থে, গঙ্গাদি তীর্থবিশেষে, আর প্রেতশ্রাদ্ধে তিল-তর্পণে বারাদি কোন দোষ নাই। মহালয়া অমাবস্যার পূর্ব্বপ্রতিপৎ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্যন্ত এক পক্ষের নাম'প্রেতপক্ষ।

ইহাতে তিলতর্পণে কোন বারাদি দোষ নাই। (পুরোহিত দর্পণ)

প্রশ্ন ৩: ব্রহ্ম নিরাকার আর কোন নিরাকার বস্তুর প্রকাশ সৃষ্টি হয় কিভাবে ?

উত্তর: বায়ু নিরাকার কিন্তু ঘনীভূত করে বোতল বন্দী করুন তাহলে দেখবেন সাকার। আর ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান একটি শক্তি, শক্তির রূপান্তর হয় (জল ঈশ্বর হচ্ছেন এমন এক শক্তি যিনি রূপান্তর হয়ে একাধিক শক্তিতে পরিণত হন।
যদি শাস্ত্রের কথা বলেন তবে উনি সর্বশক্তিমান তাই উনার ইচ্ছায় উনি সাকার রুপ ধারণ করেছেন তাঁর সৃষ্ট এই মায়ার জগতে।

প্রশ্ন ৪: আমরা সনাতনীরা অনেকেই আমাদের গুরুজনদের পা স্পর্শ করে প্রণাম করি, তাদের সামনে ঝুঁকে কিংবা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি; সনাতন শাস্ত্রে কি ঈশ্বর ব্যাতিত অন্য কারও পা স্পর্শ করে প্রণাম করার বিধান আছে? আর যদি থাকে তাহলে সেটা কি ব্যক্তি বিশেষে (শুধু ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব)? নাকি সকল গুরুজন?

উত্তর: "গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।" (বেদান্তসার - ২৪)
গুরু হচ্ছে সেই যাঁর থেকে আমরা কিছু না কিছু শিখি । মা বাবাও আমাদের গুরু। তাছাড়া শাস্ত্রে পিতাকে স্বর্গের সমান বলা হয়েছে আর মাতাকে স্বর্গের থেকেও শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস, পুরাণ পড়লেও বহু জায়গায় গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির বিষয়ে (পা ছুঁয়ে প্রণামের উদাহরণও পাওয়া যায়) দেখা যায়। ইতিহাস পুরাণকে আবার পঞ্চম বেদ বলা হয় (ইতিহাস হচ্ছে রামায়ণ, মহাভারত)। অদ্বৈতজ্ঞান অনুযায়ী সবার মধ্যেই ঈশ্বর আছে। এমনকী আমরা যে একে অপরকে নমষ্কার জানাই সেটা মূলত ঈশ্বরকেই প্রণাম জানাই।
অতএব, গুরুজন মাত্রই প্রণম্য!

প্রশ্ন ৫: প্রনাম কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই দেবপূজায় প্রশস্ত। পূজান্তে এইরূপ প্রণাম করিতে হয়। পূজাকালে আসনোপবিষ্ট পূজক করযোড়ে প্রণাম করিবে।
অষ্টাঙ্গ-প্রণাম
পড্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।। তন্ত্রসার।
অনুবাদ: পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ, মস্তক, চক্ষুঃ, বাক্য ও মন এই অষ্ট অঙ্গ দ্বারা প্রণামকে অষ্টাঙ্গ-প্রণাম বলে।
পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম :
বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ।। তন্ত্রসার।
অনুবাদ: বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষুঃ এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম বলে।
(সোর্স - পুরোহিত দর্পণ, পৃষ্ঠা ৪৫)

শিব তাংডব স্তোত্রম্

জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলে
গলেবলংব্য লংবিতাং ভুজংগতুংগমালিকাম্ ।
ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদবড্ডমর্বয়ং
চকার চংডতাংডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্ ॥ 1 ॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥

অনুবাদ: সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের নহে, কারণ দেবযান নামক বিস্তীর্ণ পথ এই সত্য দ্বারাই লাভ করা যায়, আপ্তকাম (বাসনাবিহীন) ঋষিগণ যে পথ দ্বারা সত্যের পরম উৎকৃষ্ট নিধান বা ফল যেখানে আছে, সেখানে গমন করেন॥

(অথর্ববেদ-মুণ্ডক উপনিষদ-৩/১/৬)

ললাটচত্বরজ্বলদ্ধনংজয়স্ফুলিংগভা-
-নিপীতপংচসাযকং নমন্নিলিংপনাযকম্ ।
সুধামযূখলেখয়া বিরাজমানশেখরং
মহাকপালিসংপদেশিরোজটালমস্তু নঃ ॥ 6 ॥